

অনেকগুলি করে টাকা নেয়, শুধু গালগল্প শোনার জন্যে এতো টাকা দেয়ার কোনো মানে হয় না।

কিবরিয়া ভাই কিন্তু রুমীকে নানাভাবে জোর করে মনোবিজ্ঞানীর কাছে পাঠানোর চেষ্টা করতে থাকলেন। রুমীকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন মানুষের মন কি বিচিত্র, সাধারণ মানুষ যা ধরতে পারে না মনোবিজ্ঞানীরা তা ধরে ঠিক সমস্যাটা খুঁজে বের করতে পারেন। টাকার কথা বলে লাভ নেই, কিবরিয়া ভাই তাহলে নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে দেবেন। শেষ পর্যন্ত আর একবার চেষ্টা করতে রাজি হলো রুমী। কিন্তু এই শেষ, যদি তার কোনো উপকার না হয় সে সবকিছু ছেড়েছুড়ে দেবে।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানীর কাছে আর যেতে হলো না তাকে, তার আগেই একটা ছোট ঘটনা অনেককিছু পাল্টে দিল।

বাসে করে আসছিল ও, প্রচণ্ড ভিড় কিন্তু বসার জায়গা পেয়েছে সে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলো, আবছা আবছা ভাবে সে বুঝতে পারে আবার একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে তার ভেতরে। প্রচণ্ড ভয় আর অস্থিতিতে ছটফট করতে থাকে রুমী। তাড়াতাড়ি হলে পৌছে চারটে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়বে। আগে দুটো খেলেই ঘুমোতে পারতো, আজকাল চারটের কমে হয় না। যখনই তার মনে হয় কোন ধরনের ভয়ানক অভিজ্ঞতা হতে পারে, তখনই ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, পরের দুদিন গা ম্যাজম্যাজ করে, মাথা ভার হয়ে থাকে তবুও সে বেশ কিছুদিন থেকে তাই করে আসছে।

ওর কাঁধে হাত দিল কে যেন। ঘুরে তাকিয়ে দেখে একজন বুড়োমতো লোক। মাথায় সাদা কিস্তী টুপি, পরনে আধময়লা শাট, ওর পাশে বসে আছে। গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করে ওকে, বাবা, তোমার কি হয়েছে?

অবাক হয়ে লোকটির দিকে তাকায় রুমী, চোখ দুটি কি আশ্চর্য স্বচ্ছ! হঠাৎ করে মনে হয় খুব আপনজন। মাথা নেড়ে বললো রুমী, কিছু হয়নি তো।

লোকটা গলা আরও নামিয়ে বলে, বলো আমাকে, কি হয়েছে?

রুমী আবার বলতে যাচ্ছিল কিছু হয়নি কিন্তু লোকটা বাধা দেয়, আমাকে বলো, আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারবো।

অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে রুমী, আপনি কি করে বুঝলেন আমার কিছু হয়েছে?

বোঝা যায় বাবা, মানুষের মুখ দেখলে সব বোঝা যায়। বলো বাবা আমাকে, তোমার কিসের ভয় এতো?

কি বলবে বুঝতে পারছিল না রুমী। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমার কিছু একটা হয়েছে তাই এতো অশান্তিতে আছি, কাউকে বললে বিশ্বাস করবে না।

আমি বিশ্বাস করবো, বাবা।

রুমী লোকটার চোখের দিকে তাকায়, এতো আশ্চর্য স্বচ্ছ কোমল চোখ সে জীবনে কখনো দেখেনি। লোকটা দেখতে এতো সাধারণ, আধময়লা কাপড়, মাথায় একটা টুপি,

কিন্তু চোখ দুটির দিকে তাকালে সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়। এ সাধারণ মানুষ নয়, রুমীর হঠাৎ তাকে বিশ্বাস হয়, একে সব খুলে বলা যায়। সে গলা নামিয়ে তার কথা বলতে শুরু করে। লোকটা গম্ভীর হয়ে শোনে, একটি দুটি প্রশ্ন করে, তারপর চুপ হয়ে যায় অনেকক্ষণের জন্যে।

বাস ততক্ষণে কার্জন হলের কাছে চলে এসেছে, ওরা দুজনে নেমে পড়ে সেখানে, হেঁটে হেঁটে পুরোনো হাইকোর্টের সামনে একটা গাছের নিচে বসে।

রুমী তার সব কথা শেষ করে বললো, বিশ্বাস হয় আপনার?

লোকটা একটু হেসে আস্তে আস্তে বললো, আল্লাহর দুনিয়ায় কত কি আছে, বিশ্বাস না করলে চলে না, বাবা। আমি নিজে কত কি দেখেছি, বললে লোকে পাগল ভাবে। তোমার কোনো ভয় নেই বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিভাবে?

এমনি ঠিক হয়ে যাবে, বাবা। তোমার ভেতরে একটা ক্ষমতা হয়েছে যেটা অন্য লোকের নাই। কেন হলো আমি জানি না। আশ্চর্য মানুষের মন, কিভাবে কাজ করে কেউ জানে না। হয়তো ঐসব লোক তোমার মাথায় কিছু করেছে, হয়তো তোমার মাথায় অপারেশন করার সময় কিছু হয়েছে, কে জানে এমনিতেই হয়তো হয়েছে। তোমার এটা ভালো লাগে না, তুমি ভয় পাও সেটাই হয়েছে তোমার জন্যে মুশকিল। তুমি ভয় পেয়ো না, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার মন তোমার কথায় ওঠে বসে, যা তোমার ভালো লাগে না তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে না।

কিন্তু...

হ্যাঁ, বাবা। তুমি অশিক্ষিত লোক হলে তোমাকে একটা তাবিজ দিয়ে বলতাম, এটা গলায় ঝুলিয়ে রাখো তোমার আর অসুবিধা হবে না। তুমি সেটা বিশ্বাস করে ভাবতে তোমার আর কিছু হবে না, তখন সত্যিই তোমার কিছু হতো না। কিন্তু তুমি যে মুর্থ লোক নও, তোমাকে ঠকানো কেমন করে বলো?

একটু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললো রুমী, এতো সহজ ব্যাপারটা?

হ্যাঁ, বাবা। এতো সহজ। যদি তুমি চাও। আর যদি না চাও অনেক কঠিন। তুমি যদি মনে করো, বিশ্বাস করো তোমার আর কোনদিন এরকম হবে না তাহলে সত্যিই কোনদিন হবে না। তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে। তোমার মন তোমার কথায় ওঠে বসে, সেটা তোমার বিশ্বাস করতে হবে। নিজের উপরে বিশ্বাস। পারবে?

উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে রুমী। লোকটা আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, এর মানে পারবে না। বিশ্বাস নেই নিজের ওপর।

না, বিশ্বাস থাকবে না কেন। কিন্তু...

ঐ কিন্তুটাই হচ্ছে বিশ্বাসের অভাব। তুমি জানো না, বাবা, মানুষের ভেতরে কি শক্তি আছে। পৃথিবীতে কিছু নেই যা মানুষের সাথে পারে, মানুষ জানে না বলে ভয় পায়। যখন ভয় পায় তখন সেই শক্তি চলে যায়। তুমি তোমার ক্ষমতাটা পছন্দ করো না, যদি করতে তাহলে কি বলতাম জানো?

কি?

বলতাম এসব লোকগুলোর ওপর তুমি জোর খাটাও, ওদের সব শক্তি কেড়ে নাও, ওদের জন্মের মতো শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও। কিন্তু তুমি তোমার ক্ষমতাটা পছন্দ করো না, তোমার কাছে খারাপ মনে হয়। তাই তোমাকে আমি কখনো বলবো না সেটা করত। কিন্তু তুমি নিজেকে কষ্ট দিও না। যেটা পছন্দ করো না সেটা কেন ঘটতে দাও? এটা তো অসুখের বীজাণু নয় যে রক্তের মাঝে আছে। এটা তোমার নিজের মন, ধমক দিয়ে থামিয়ে দাও। যদি না পারো নিজেকে ব্যস্ত রাখো, বন্ধুর সাথে গল্প করো, কিছু তৈরি করো, কিছু ভেঙে ফেলো, রাজনীতি করো, তর্ক করো, ঝগড়া করো, মারামারি করো, কিছু একটা করো। বসে থেকে তোমার মাঝে ওটা ঘটতে দিও না।

লোকটা একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল বলে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। গলা নামিয়ে বললো, বাবা, কিছু মনে করেনি তো?

না, না, মনে করবো কি? আপনি তো ঠিকই বলেছেন, আমি আসলেই কিছু করি না। একা একা থাকি, আমার ভালো কোনো বন্ধু নেই। সবসময়ই ভয় ভয় করে, মনে হয় এই বুঝি আবার কিছু হলো।

হ্যাঁ, বাবা। নিজের কাছে নিজে হেরে যেও না। এখন নিজের উপর বিশ্বাস নেই তাতে ক্ষতি কি? আস্তে আস্তে হবে। যখন নিজেকে বুঝতে পারবে তখন খুব তাড়াতাড়ি বিশ্বাস ফিরে আসবে। আজ রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোবে বলছিলে না?

হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিল রুমী। আবার সব একসাথে মনে পড়ে যায়। সাথে সাথে চাপা অস্বস্তি, ভয় সব একসাথে ফিরে আসে। রুমীর মুখে তার স্পষ্ট ছাপ পড়ে।

এই যে, এই যে, বাবা, তুমি আবার ভয় পাচ্ছে। লোকটা হতশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। খানিকক্ষণ কি যেন ভেবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আজ রাতে যদি তোমার কিছু না হয় তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে?

আপনার কথা আমি কখনো অবিশ্বাস করিনি।

আমি বলছিলাম তোমার কথা, নিজের ওপর বিশ্বাসের কথা। করবে?

করবো।

তার জন্যে তুমি কতোটুকু কষ্ট করতে পারবে, বাবা?

যতোটুকু দরকার।

পুরো রাত?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে। লোকটা শার্টের পকেট থেকে একটা ওষুধের শিশি বের করে বলে, এটা খুব একটা দরকারী ওষুধ, বাজারে পাওয়া যায় না। টাঙ্গাইলে একজনের এটা খুব দরকার। আজ রাতের মধ্যে এটা যদি তাকে খাওয়ানো যায় তাহলে সে বেঁচে যেতে পারে। আমি এটা নিয়ে টাঙ্গাইল যাচ্ছিলাম। এখন আমি আর যাবো না। তুমি এটা পৌঁছে দিয়ে এসো, বাবা।

শুনো একটু হকচকিয়ে যায় রুমী, সে এ ধরনের কিছু আশা করেনি। লোকটার সদিচ্ছায় ওর কোনো সন্দেহ নেই, যদি সত্যি ওষুধটা টাঙ্গাইলে পৌঁছে দিয়ে এলে সে ভালো হয়ে যায়, তাহলে কেন যাবে না? কিন্তু ওর ভয় ভয় করতে থাকে, এখন ওর ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে থাকার কথা।

লোকটা পকেট থেকে কটা দুমড়ানো মোচড়ানো নোট বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, ভাড়াটা...

সে কি, আপনি ভাড়া দেবেন কেন, আমি দিয়ে দেব।

না, বাবা, কাজটা আমার। তাছাড়া আমি চাই তুমি এখান থেকে সোজা রওনা দিয়ে দাও।

কেন? হল থেকে কয়টা দরকারী জিনিস একটা ব্যাগে...

না, বাবা, তুমি সোজা এখান থেকে যাবে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ওষুধটা পৌঁছানো দরকার; কিন্তু আমি সেজন্যে বলছি না, আমি তোমার নিজের জন্যেই বলছি। নাও, বা, টাকাসুলি ধরো।

রুমী একটু ইতস্ততঃ করে বলে, আমার পকেটে কিছু টাকা আছে, টিউশানি বাবদ গত মাসের টাকাটা সে আজকেই পেয়েছে। যাওয়া আসার ভাড়া উঠে যাবে।

তবু এটা রাখো, বাবা। ভাড়া যদি নিজে দিতে চাও, দিও। এই টাকাটা তাহলে ঐ লোকটাকে দিয়ে দিও। লোকটা পকেট হাতড়ে একটা চিরকুটের মতো কাগজ বের করে ওর হাতে দেয়, উপরে লেখা কোথায় যেতে হবে।

ঠিক আছে, বাবা, তুমি তাহলে যাও। মনে রেখো, আজ রাতে এই ওষুধটা খেলে লোকটা হয়তো বেঁচে যাবে। আল্লাহ যদি চান তাহলে তার জীবনটা এখন তোমার হাতে। লোকটা তার শক্ত হাতে রুমীর হাত স্পর্শ করে বিদায় নেয়, আল্লাহ তোমার ভালো করবেন, তুমি এখন যাও, বাবা। রুমীর উৎসুক চোখের দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে অনুনয়ের স্বরে বলে, বাবা তুমি আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না, মিথ্যে বলতে আমার কুব কষ্ট হয়...

রুমী আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। কি আশ্চর্য লোক! ও তাকিয়ে তাকিয়ে লোকটাকে চলে যেতে দেখে। দ্রুত হেঁটে রাস্তার লোকজনের মাঝে মিশে গেল লোকটা, কে জানে আর কখনো দেখা হবে কিনা।

সে-রাতের অভিজ্ঞতার কোনো তুলনা নেই। রুমী রাতের অন্ধকারে বাসের পিছনে বসে আছে। প্রচণ্ড ঝড় বাইরে, আকাশ চিরে বিজলী নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে। বাস যাচ্ছে আহত জন্তুর মতো শব্দ করতে করতে। মাঝে মাঝে চাপা দুঃস্বপ্নের মতো কি একটা ওর ওপর ভর করতে চায়, কিন্তু সে প্রাণপণে তার সাথে যুদ্ধ করে, ওর ওপর এখন একজন অসুস্থ মানুষের জীবন মরণ নির্ভর করছে, এখন সে অন্য কিছুকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে ও, মন থেকে সব চিন্তা দূরে সরিয়ে দেয়, তারপর বাইরে ঝড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রথম একবার দুবার ওর মনে হতে থাকে সে বুঝি পারবে না, প্রায় হাল ছেড়ে দিতে গিয়ে অনুভব করে, ভেতরে কে যেন ক্রমাগত বলতে থাকে—না, না, না কিছুতেই না, কি-ছু-তে-ই-না! আর সত্যি সত্যি কিছুক্ষণ পর ও বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে আবার বের হয়ে আসে। আস্তে আস্তে ও সাহস ফিরে পায়। বুঝতে পারে সত্যি সত্যি সে যদি চায়, তাহলে আর চেতনা হারিয়ে অন্ধকার জগতের দাসত্ব করতে হবে না। ঐ অনুভূতিটা কি আনন্দের, কি পরিতৃপ্তির, ওর বহুকাল এরকম অনুভূতি হয়নি।

মাঝ রাত্রে বাস যখন টাঙ্গাইল পৌঁছেছে তখন বাসের সবাই আধো ঘুমে, সে নিজেও খুব ক্লান্ত, কিন্তু ওর চোখে ঘুমের রেশ নেই, মনে ফুরফুরে একটা আনন্দ। বাস স্টেশনের কাছে একটা রেস্টুরেন্টে গরম এক কাপ চা খেয়ে সে চান্সা হয়ে নিল। রেস্টুরেন্টের লোকজনকে ঠিকানাটা দেখিয়ে সে-জায়গাটা কোথায় সে-সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেয়। ভাগ্য ভালো থাকলে এতো রাত্রে রিকশা পেতেও পারে, কিন্তু পুরো রাস্তা রিকশা করে যাওয়া সম্ভব না, অন্তত মাইলখানেক ওকে হাঁটতে হবে। সে-নিয়ে কোনো দৃষ্টিস্তা নেই রুমীর, হালকা মনে শিস দিতে দিতে বের হয়ে পড়ে।

বাসাটা সে বেশ তাড়াতাড়িই খুঁজে বের করে ফেলে। জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা, বাঁশের ঘরের উপর নড়বড়ে টিনের ছাদ। ভেতরে কোথায় জানি একটা মিটমিটে বাতি জ্বলছে। রুমী দরজার কড়া নাড়ে, বেশ অনেকক্ষণ পর জানালা খুলে একজন মেয়ে ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করে, কে?

আমি, ঢাকা থেকে ওষুধ নিয়ে এসেছি।

ওষুধ! মেয়েটা আনন্দে চিংকার করে ওঠে, ওষুধ এনেছে মা, ওষুধ!

দরজা খুলে হারিকেন হাতে একজন মহিলা পাগলের মতো বের হয়ে এলেন। রুমীর হাত জড়িয়ে ধরে সাগ্রহে ওষুধটা হাতে নিলেন। উদভ্রান্তের মতো চেহারা, ঝড়ে দিকভ্রষ্ট নাবিকের চেহারাও বুঝি এতো ব্যাকুল নয়। রুমীকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে তারা ভিতরে চলে গেল। ভিতর থেকে অস্ফুট কথাবার্তা শোনা যেতে থাকে, চামচের টুঙাৎ শব্দ, একটু চাপা কান্না, দীর্ঘশ্বাস। রুমী চুপচাপ বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভেতরে একজন মানুষ মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করছে, ও কখনো দেখেনি মানুষটাকে, কিছু জানে না তার সম্পর্কে, কিন্তু তবু কি আশ্চর্য, বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করছে সে, মনপ্রাণে কামনা করছে লোকটা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসুক।

দুদিন পর ফিরে এলো রুমী। অসুস্থ লোকটা উঠে পথ্য করার পর। দুদিনের পরিশ্রমেই সে বেশ শুকিয়ে গেছে, পরিবর্তনটা সবাই লক্ষ্য করে। ও এখন অনেক হাসিখুশি, অনেক চঞ্চল। একেবারে অন্য মানুষ হয়ে ফিরে এসেছে সে। ও জানে, ও ভালো হয়ে গেছে।

সাদাসিধে সেই লোকটাকে রুমী অনেক খুঁজেছে, আর পায়নি। নিজের অজান্তে লোকজনের ভিড়ে সেই মুখটা খুঁজতে থাকে, বড় ইচ্ছা করে আরেকবার কথা বলতে, অন্তত কৃতজ্ঞতাটুকু জানাতে। কিন্তু তাকে আর কখনো দেখেনি সে।



www.banglabook.com

তৃতীয় অংশ আরেক বিধাতা

আট

তিন বছর পর।

তিন বছর অনেক সময়, অনেক কিছু ঘটতে পারে এর মধ্যে, কিন্তু রুমীর খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে কিছুটা, তার উপর গৌফ রেখেছে, তাই দেখতে একটু ভারি লাগে আজকাল। চিন্তা ভাবনা অনেক স্পষ্ট হয়েছে, দেশ বিদেশের সত্যি খবর রাখে তাই আপাতদৃষ্টিতে তাকে উচ্চাশাহীন সাদামাঠা ছেলে বলে ভুল হতে পারে। বই পড়ার অভ্যাস দিনে দিনে আরও বেড়েছে। চোখ খারাপ হয়ে থাকতে পারে, ক্লাসে পিছনে বসলে সে বোর্ডের লেখা ভালো দেখতে পায় না, তবুও কখনো চোখের ডাক্তারের কাছে যায়নি। ওর ভয় হয় ডাক্তার জোর করে ওকে চশমা দিয়ে দেবেন। চোখে চশমা ও দুচোখে দেখতে পারে না, আলগা বুদ্ধিজীবীর একটা ভাব ফুটে ওঠে যেটা ওর ভারি অপছন্দ।

তিন বছরে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার ঘটেছে রুমীর জীবনে। সে প্রেমে পড়েছিল আবার আঘাত পেয়ে ফিরেও এসেছে, এখনো সে ভুলতে পারে না, প্রায় প্রতিদিনই তার বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে যায়। চমৎকার মেয়েটি ছিল, ওদের ক্লাসের অনেকেই ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়েছিল মেয়েটির জন্যে। সুন্দরী হিসেবে মেয়েটিকে ওরও ভালো লাগতো, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করতো গল্প করতে কিন্তু কখনো সে-চেষ্টা করেনি। ওর ধারণা ছিল যেচে কোনো মেয়ের সাথে গল্প করা হ্যাংলোমোর পর্যায়ে পড়ে। ওদের একজন শিক্ষক তখন নতুন পি. এইচ. ডি. করে এদেশে ফিরে এসেছেন। সুদর্শন অল্পবয়সী ভদ্রলোক, করিডোরে দাঁড়িয়ে ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সাথে গল্প করতে ভালোবাসেন। ফাজিল ছেলেরা বলে, বিয়ে করেননি তাই মেয়ে পছন্দ করার চেষ্টা করছেন। রুমীও দু'একদিন তার গল্প শুনেছে, এমনিতে মানুষটা খারাপ নন, নিজের বিষয়ে জানান খুব ভালো, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে সাধারণ। রুমী বাজি রেখে বলতে পারে ভদ্রলোক রিডার্স ডাইজেষ্ট পড়েন এবং বিশ্বাসও করেন। রুমীর এমনিতে কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু ভদ্রলোক যখন রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন সে চুপ থাকতে পারলো না। তাঁর প্রথম কথাটি শুনেই সে বলে উঠলো, না, স্যার, আপনি ভুল বলছেন।

ভুল? ভদ্রলোকের ফর্সা চেহারা একটু লাল হয়ে ওঠে। এ সপ্তাহের নিউজ টুকে...

না, স্যার, ওটা ভুল। নিউজ উইকের খবরটা পড়তে পারেন কিন্তু তার অ্যানালিসিস পড়বেন না। ওটা ওয়েস্টার্ন দৃষ্টিভঙ্গি। আমি আপনাকে চারটি ভিন্ন ভিন্ন কাগজের নাম বলতে পারি যারা ওরকম করে দেখবে না। রুমী কাগজগুলির নাম বললো, কে কি লিখেছে তাও বললো। কিবরিয়া ভাইয়ের কাছে সে তর্ক করা শিখেছে, উদাহরণ না দিয়ে সে কখনো কথা বলে না।

তাই বলে তুমি নিউজ উইককে অবিশ্বাস করবে? জানো ওদের সার্কুলেশন কতো?

রুমী সঠিক সংখ্যাটি বলতেই ভদ্রলোক একটু হকচকিয়ে গেলেন। রুমী ঠাণ্ডা গলায় ভদ্রলোককে বোঝাতে শুরু করে, নিউজ উইক টাইম ওরা তো কাগজের ব্যবসা করে। ওরা খবরগুলি এমনভাবে ছাপায় যেন মানুষের পড়তে ভালো লাগে, না হলে লোকে ওদের কাগজ কিনবে কেন। থার্ড ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে ওরা কি ভাবে আপনি কখনো খেয়াল করে দেখেছেন?

ভদ্রলোককে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই সে উদাহরণ দিতে শুরু করে কবে বাংলাদেশকে নিয়ে কি লিখেছে যা লেখার কোনো মানে হয় না, কবে কোন্ সত্যকে বিকৃত করেছে, কবে কোন্ সত্যকে গোপন করেছে, কবে কোন্ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে অবহেলা করেছে। এটা রুমীর প্রিয় বিষয়, সে এতো জানে এ সম্পর্কে যে আজকাল কিবরিয়া ভাইও তার সাথে সাবধানে কথা বলেন। ভদ্রলোক একেবারে চুপসে গেলেন। এরপর আর কোনো গল্পই জমলো না, ভদ্রলোক একটা ক্লাসের অজুহাত দিয়ে চলে গেলেন। তিনি চোখের আড়াল হতেই সেই মেয়েটি খুব অবাক হয়ে বললো, তুমি তো খুব জোর দিয়ে কথা বলো, আমি সবসময়ে ভাবতাম তুমি বুঝি খুব চুপচাপ।

রুমী মেয়েটার চোখের দিকে তাকায়, সুন্দর বিস্ময়াভিভূত চোখ দুটি দেখে ওর ভিতরে কি যেন নড়েচড়ে যায়। একটু হাসার ভঙ্গি করে বলে, আমি এমনিতে চুপচাপই। কেউ বিদেশীদের মতো কথা বললে কেন জানি চুপ করে থাকতে পারি না। মাথা চুলকে বলে, বেশি বলে ফেললাম কিনা কে জানে, স্যারের পরীক্ষা সামনে।

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে ওঠে খুব মিষ্টি স্বরে। বলে, না-না খুব ভালো করেছে। এখন যদি স্যারের গল্প করা কিছুটা কমে।

ক্লাসের ফাজিল মেয়েটা বললো, কবে যে স্যারের বিয়ে হবে আর আমরা রেহাই পাবো।

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। এ নিয়ে খানিকক্ষণ হাসাহাসি চলে, মেয়েটি একটু পরে আবার আগের ব্যাপার টেনে আনে, তুমি বুঝি এসব নিয়ে খুব ভারো?

রুমীর বুকের ভেতর কি যেন ঘটে যায়, কথা বলতে কষ্ট হয় ওর। কোনমতে বলে, বেশি আর কোথায়।

কিন্তু তুমি তো স্যারকে বলেছো খুব ভালো, এতোগুলো রেফারেন্স দিয়েছো যে বেচারী স্যার কিছুই বলতে পারলেন না। আমেরিকা থেকে এসেছেন মোটে তিন মাস।

মেয়েটিকে রুমীর এত ভালো লেগে যায় যে বলার নয়। ইচ্ছে করে কাছে টেনে এনে ওর চুল হাত বুলিয়ে দেয়। নিজেকে ওর অনেক বড় মনে হয়, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস অনুভব করে নিজের ভেতর। মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে সে, কি হলো মেয়েটির কে জানে, হঠাৎ লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়।

ফাজিল মেয়েটি বললো, ঐ যা!

এরপর রুমীকে প্রায়ই ঐ মেয়েটির সাথে দেখা যেতে লাগলো—করিডোরে কথা বলছে, কেটিনে চা খাচ্ছে, লনে বসে চিনাবাদাম চিবুচ্ছে। এক ছুটির দিনে দুজন লুকিয়ে সিনেমাও দেখতে গেল।

রুমীর জীবনে সবচেয়ে আনন্দের সময় ছিল সেই কটা মাস। মেয়েটির জন্যে কি করবে সে ভেবে পেত না। ইচ্ছে করতো মেয়েটিকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে,

সমুদ্রের ধারে নারকেল গাছের ছায়ায়, নীল আকাশের নিচে নীল সমুদ্রের তীরে যেখানে তরঙ্গ পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে। রাতে পড়তে বসে আনমনা হয়ে যেতো সে।

ঠিক বুঝতে পারেনি রুমী মেয়েটি আস্তে আস্তে কেমন জানি চুপচাপ হয়ে গুটিয়ে যেতে থাকে নিজের ভেতর। প্রায়ই মনে হতো মেয়েটি ওকে কি যেন বলতে চায় কিন্তু পারে না। কি বলতে চায় ও যখন বুঝলো তখন মেয়েটির বিয়ের কার্ড ছাপা হয়ে গেছে। প্রচণ্ড একটা আঘাত পেল রুমী, কেউ যেন ধারালো একটা ছুরি দিয়ে নিপুণ ভাবে ওর ভেতরটা চিরে দিয়ে গেছে। জীবন অর্থহীন হয়ে ওঠে ওর কাছে, প্রচণ্ড শূন্যতা নিয়ে দিনের পর দিন কাটে, কি করবে সে বুঝতে পারে না। আস্তে আস্তে সামলে নিয়েছে নিজেকে, শুধু বুকের ভেতর কোথায় জানি খানিকটা শূন্যতা রয়ে গেছে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালে এখনো মেয়েটির কথা মনে হয় ওর। কোথায় আছে সে?

বিয়ের পর পরই মেয়েটি তার স্বামীর সাথে আমেরিকা চলে গিয়েছিল। অনেক চিন্তা করে সে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে যদি না চাইতো ওখানে বিয়ে হতো না। ইচ্ছে করলে সে রুমীকেই বিয়ে করতে পারতো। কিন্তু সে অনেক ভেবে দেখেছে রুমীর সাথে তার খাপ খাবে না। খুব ভালো লাগতো ওর রুমীকে, ইচ্ছে করতো রুমীর মাথা নিজের বুক চোপে ধরে রাখে, কিন্তু ও জানে বিয়ে হলে সব অন্যরকম হয়ে যাবে। ওর নিজের বোনকে দেখে শিখেছে, কত ভালবাসা ছিল ওর বোনের। বিয়ের একবছরের ভেতর দুজন দুরকম হয়ে গেল, ছোটখাট জিনিস নিয়ে কি ভয়ানক ঝগড়া করে দুজন। ওর নিজের অনেক শখ, বিদেশে যাবে, চমৎকার একটা বাসা হবে দেশে ফিরে এলে, ওর ফুটফুটে ছেলেমেয়েরা বাসার লনে গুটি গুটি হেঁটে বেড়াবে। লাল একটা গাড়ি হবে ওদের, ছুটিতে ওরা ব্যাংকক বেড়াতে যাবে। কিন্তু রুমী অন্যরকম। ভবিষ্যতের কথা বললেই ওর চোখ স্বপ্নালু হয়ে যায়, টিনের ছাদে কমকাম করে বৃষ্টি পড়ছে, পাল তোলা নৌকায় বসে হাওড়ের কালো পানির দিকে তাকিয়ে আছে, এর বেশি সে কল্পনা করতে পারে না। ওরা দুজন দুরকম, ওদের বিয়ে হলে সবকিছু গোলমাল হয়ে যাবে। অনেক ভেবেছে সে, অনেক ভেবে সে এখানে বিয়ে করেছে। রুমীর কথা মনে হয় এখনো, বড় ভালো ছেলে, তাকে নিশ্চয়ই খুব ভাল বুঝেছে, কিন্তু কি করবে সে? রুমীর জন্যে সে তো ঠিক মেয়ে নয়, জীবন অনেক দীর্ঘ সময়, সেটা তো সে নষ্ট করতে পারে না, তার নিজেরটাও নয়, রুমীরটাও নয়।

ভদ্রলোকের নাম ডঃ আজহার আলী, বাঙালী, কিন্তু বিদেশেই থাকেন। দেশে এসেছিলেন, বেশিদিন থাকতে পারেননি, মোহভঙ্গ হয়ে ফিরে গেছেন। প্রখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী দূর গ্যালাক্সির আলো বিশ্লেষণ করে কিভাবে জানি মুক্ত কোয়ার্কের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। সারা পৃথিবীতে খুব হৈ-ঠে এ নিয়ে, রুমী নিজে নিউজ উইকে ভদ্রলোকের ছবি দেখেছে। সারাদিন আগে দেশে এসেছিলেন, সেমিনারে লোক আর ধরে না। হলের কমন্সরুমের টেলিভিশনে দেখেছে রুমী, বেশি বয়স না, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে হয়তো। বাংলা বলেন একটু অদ্ভুতভাবে, দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে বোধ করি এমন হয়েছে।

আদিল রহমান, মধ্যবয়স্ক কিন্তু এখনো প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর। প্রযোজকরা কেউ তাকে ছবি তৈরি করার টাকা দিতে চায় না। নিজের সবকিছু বিক্রি করে ধারদেনা করে ছবি তৈরি করলেন, 'হাতছানি'। কোনো সিনেমা হল প্রথমে দেখাতে রাজি হলো না। একটিতে কোনরকমে এক সপ্তাহ টিকে থাকলো, লোকজন দেখতে পর্যন্ত গেল না। কাগজে কিন্তু খুব ভালো সমালোচনা বের হলো, বিজ্ঞ লোকেরা যথেষ্ট প্রশংসা করলেন, তবু সেই ছবি বাজার পেল না। লোকজন ভুলেই গিয়েছিল 'হাতছানি'র কথা, বার্লিনের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেটা সর্বশ্রেষ্ঠ ছায়াছবি হিসেবে সে-বছর প্রথম পুরস্কার পেয়ে গেল। শুধু তাই নয় এ ছবিরই পরিচালক এবং চরিত্রাভিনেতা শ্রেষ্ঠ হিসেবে সম্মান পেলেন। দেশে হৈ-চৈ পড়ে গেল, সব জায়গায় শুধু 'হাতছানি'র গল্প। লোক ভেঙে পড়লো ছবি দেখতে। আদিল রহমান মাথা উচু করে দেশে ফিরে এলেন। তাঁকে নিয়ে কি মাতামতি।

হৈ-চৈ কমে এলে আবার ছবি করতে চাইলেন ভদ্রলোক, প্রচণ্ড বাধা পেলেন আবার। স্টুডিওর লোকেরা সহযোগিতা করলো না, নায়ককে গুম করে ফেলার ভয় দেখানো হলো। ভদ্রলোকের বাড়িতে গ্রেনেড ফাটলো একদিন। আদিল রহমান সেই সপ্তাহেই স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে ইতালী চলে গেলেন। আর ফিরে আসেননি। সেখানকার কি একটা ফিল্মের স্কুলে নাকি পড়ান এখন।

শাজাহান সুজা, বয়স মাত্র ত্রিশ, তাঁর আঁকা তেল রঙের ছবি 'প্রিন্স' ওয়াশিংটন ডি. সি.-র মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস এক মিলিয়ন ডলার দিয়ে কিনে নিয়েছে। টাকাটা অবশ্য শাজাহান সুজা পাননি, পেয়েছে অন্য লোক যার কাছে ছবিটা বিক্রি করেছিলেন তিনি। খুব প্রিয় ছবি ছিল তাঁর, নেহায়েত বিদেশে অর্থকষ্টে পড়েছিলেন বলে বিক্রি করেছিলেন ওটা। টাকা না পেলেও সম্মান ঠিকই পেয়েছিলেন। পৃথিবীর সব বড় বড় শিল্প সমালোচক প্রিন্সকে অসাধারণ কালজয়ী ছবি হিসেবে প্রশংসা করেছে। প্রিন্স ছবিটি কিন্তু খুব সাধারণ, কোনো নতুন টেকনিক বা স্টাইল নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা নেই। বিমূর্ত ছবি নয়, ছবিতে সত্যি সত্যি প্রিন্স বা রাজপুত্রকে চেনা যাচ্ছে, ক্ষুধার্ত উলঙ্গ একটি শিশু উবু হয়ে বসে তাকিয়ে আছে, জ্বলজ্বলে চোখে। অতি সাধারণ ছবি ভালো একটা ক্যামেরা দিয়ে অনায়াসে এ রকম একটা ছবি তোলা যায় এদেশের পথেঘাটে। কিন্তু তবু ছবিটিতে কি যেন একটা রয়েছে, অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত নির্মম, অত্যন্ত নিষ্করুণ যা শুধু একজন শিল্পীই সৃষ্টি করতে পারে, ক্যামেরা পারে না। তাই সাধারণ ছবি হয়েছে প্রিন্স অসাধারণ ছবি। যে-ই দেখেছে সে-ই স্বীকার করেছে এটা শুধু ছবি নয়, এটা গোটা পৃথিবীর দুঃখ কষ্টের ইতিহাস।

শাজাহান সুজা তাঁর সম্মান নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। রুমী অপেক্ষা করছিল কবে নাগাদ চলে যান দেখার জন্যে। এ দেশে কেউ থাকে না, কোনকিছুতে একটু ভালো হলেই লোকজন এ দেশ ছেড়ে চলে যায়। শাজাহান সুজা বড় শিল্পী, তাঁর থাকার তো কোনো কারণই নেই। তবু তিনি থেকে গেলেন। চুপচাপ লোক, এখনো বিয়ে করেননি। অনেক মেয়ের গোপন দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘতর করে শাজাহান সুজা ক্যামেরা নিয়ে তাঁর লাল রঙের গাড়ি করে ঢাকা শহর ঘুরে বেড়ান। রুমী খুব পছন্দ করে তাঁকে, সুযোগ পেলে একবার

কথা বলে দেখবে, এতো বিখ্যাত লোক সুযোগ পাবে কিনা সেটাই সন্দেহ। দেশের জন্যে রুমীর খুব মমতা, দেশের বড় বড় লোকজন যদি ফিরে আসে তাহলে দেশের লোককে আসা দেয়া যায়। না হলে তারা কাকে দেখে মুগ্ধ হবে, আশা পাবে? যোগ্য মানুষ এ দেশে অনেক আছে, কিন্তু তারা স্বীকৃতি পায় না যতদিন না পশ্চাত্য দেশ তাদের স্বীকৃতি দেয়। এ নিয়ে রুমীর দুঃখটা আন্তরিক।

জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্যাপারটা অনেকের চোখে পড়লো। গত কয়েক মাসে অন্তত চারটি শিশু অস্বাভাবিক ভাবে মারা গেছে। প্রথমে সবাই ভেবেছিল বুঝি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কিন্তু তিনমাসের মাথায় দেখা গেল এগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ব্যাপারটা বুঝতে তিনমাস সময় লাগার আরও একটা কারণ আছে। যে সমস্ত শিশুরা এই সময়ে মারা গেছে বা নিখোঁজ হয়েছে তারা সবাই গরীবের সন্তান, রাস্তাঘাট... বড়জোর বস্তিতে থাকে। তাদের বেঁচে থাকাটাই বিস্ময়, তাই হঠাৎ করে মারা গেলে কেউ অবাক হয় না, মায়ের বুকেফাটা আর্দ্রনাদ সভ্য লোকজনের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। কিন্তু ঢাকা শহরে তিনমাসে অন্তত চারটি শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু, দুজন নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ একটু বাড়াবাড়ি, তা সে যতো গরীবের সন্তানই হোক। প্রথম প্রথম শিশুগুলির মৃতদেহ পোস্টমর্টেম পর্যন্ত করা হয়নি। তৃতীয় শিশুটির বেলায় একটু হৈ-চৈ হলে তাকে পোস্টমর্টেম করে দেখা গেল তাকে বিষ প্রয়োগে মারা হয়েছে। চতুর্থ শিশুটিকে মারা হয়েছে গলা টিপে। শহরে এবার কিছুটা হৈ-চৈ পড়ে গেল, খবরের কাগজে লেখালেখি হলো, সমাজ ব্যবস্থাকে একচোখা বলে গালি দেয়া হলো, কিন্তু সুরাহা হলো না ব্যাপারটার। নওয়াবপুর রোডে আধপাগল গোছের একজন লোক একটা বাচ্চাকে আদর করতে গিয়ে খামোকা প্রচণ্ড মার খেলো একদিন। শহরের মা-বাবারা সতর্ক হয়ে গেলেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে আর চোখের আড়াল করতে চান না। কিন্তু যে ধরনের ছেলেমেয়েরা মারা যাচ্ছিলো সেই সব পথের শিশুরা ঠিকই পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তাদের বেঁচে থাকতে হলে ঘুরে বেড়াতে হয়, এখানে সেখানে ছোটখাট কাজ, ভিক্ষা ও চুরিচামারি করে বেঁচে থাকার রসদ জোগাতে হয়। তাদের ঘর নেই, বন্ধ হয়ে থাকবেই বা কোথায়?

ব্যাপারটা নিয়ে হৈ-চৈ হওয়ার পর প্রায় মাসখানেক কিছু ঘটলো না। একজন দুজন নিখোঁজ হয়েছে হয়তো, কিন্তু পথের ছেলেমেয়েরা কখন সত্যিই নিখোঁজ হয়েছে, আর কখন নিজেই কোথায় চলে গিয়েছে ঠিক করে বলা মুশকিল।

ফেব্রুয়ারি মাসে আবার সবার টনক নড়লো, চার বছরের একটা শিশুকে প্রকাশ্যে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। নির্মমভাবে তাকে ধারালো কিছু দিয়ে আঘাত করে মারা হয়েছে। যখন তাকে পাওয়া গেছে তখনো তার মৃতদেহ শীতল হয়ে যায়নি। মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি থেকে যেটা বড় সেটা হচ্ছে ভীতি। কি ভয়ানক ভীতি, মৃত্যুর মুখোমুখি হলেই বুঝি এরকম ভীতি সম্ভব।

সারা শহরে এবার হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। অনেকে এবার সত্যি সত্যি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো। রাজনৈতিক দলগুলি মাইক নিয়ে বস্তিতে বস্তিতে সবাইকে সচেতন করার জন্যে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে দেয়া হলো কখনো যেন তারা অপরিচিত কারো কাছে না যায়, অপরিচিত লোকদের দেয়া কিছু না খায়, কখনো যেন

একা ইটাইটি না করে, রাতে কখনো পথেঘাটে ঘুরোঘুরি না করে, সন্দেহজনক কিছু দেখলেই যেন বয়স্ক কাউকে বা পুলিশকে জানায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বয়স্ককাউট আর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীরা তাদের অফিস খুলে রাতে পাহারা দেয়া শুরু করলো।

কিন্তু তবু ব্যাপারটি বন্ধ হলো না, প্রায় নিয়মিত ভাবে দুই থেকে তিন সপ্তাহের ভেতর একটা করে শিশু নিখোঁজ হতে লাগলো। সব সময়েই যে শিশুগুলির মৃতদেহ পাওয়া যেতো তা নয়, কিন্তু যে একবার নিখোঁজ হয়েছে সে আর কখনো ঘুরে আসতো না, তা থেকে সবাই প্রায় নিঃসন্দেহ হতো যে তাদেরও মেরে ফেলা হয়েছে। আরও নিঃসন্দেহ হওয়া গেল কারণ ক'দিন পরেই সাভারের কাছে একটা ডোবায় একজন চারটে মৃতদেহ আবিষ্কার করলো। সবই বাচ্চাদের দেহ, দীর্ঘ দিনে সেগুলি বিকৃত হয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে কাউকে চেনার উপায় নেই। পুলিশ অনেকদিন খবরটা চেপে রেখে সেখানে চব্বিশ ঘন্টা গোপন পাহারার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি, হত্যাকারী সেখানে আর কখনো ফিরে আসেনি।

চেষ্টার অবশিষ্ট কোনো ক্রটি ছিল না। দিন রাত অসংখ্য পুলিশ সাদা পোশাকে সারা শহরে ছড়িয়ে থাকতো। শিশুর মৃতদেহ হাতের ছাপ বা অন্যান্য চিহ্ন খুঁজে বের করার জন্যে মূল্যবান যন্ত্রপাতি কিনে আনা হলো। ফরেনসিক এক্সপার্ট একজনের ট্রেনিং বাতিল করিয়ে দিয়ে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হলো। একদিন কারফিউ দিয়ে মিলিটারী আর পুলিশ সারা শহর তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি করলো। কেউ হত্যাকারী সম্পর্কে কোনো খোঁজ দিতে পারলে তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে বলে ঘোষণা করা হলো। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সে-টাকা ক'দিনের ভেতর বাড়িয়ে এক লাখ করে দিল, কিন্তু তবু কোনো লাভ হলো না। টাকার লোভে আজকাল লোকজন অনেক ঘন ঘন খবর নিয়ে আসে, কিন্তু সব খবরই ভিত্তিহীন। দেখতে দেখতে পাঁচ মাস হয়ে গেল, তবু ঘটনার কোনো কিনারা হলো না।

দুঃস্থ শিশুদের পথেঘাটে ঘুরে বেড়ানো বন্ধ করার জন্যে অনেক বড় বড় পরিকল্পনা নেয়া হলো। শহরের বড় বড় বস্তিতে ছোট শিশুদের জন্য লঙ্গরখানা খোলার ব্যবস্থা করা হলো। প্রচুর টাকার প্রয়োজন, সবাই নিজেদের সাধ্যমতো চেষ্টা করলো। সরকারী বেসরকারী কর্মচারীরা তাদের একদিনের বেতন দান করলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে লোকজনের কাছ থেকে টাকা তুলতে লাগলো। বড় বড় শিল্পীরা গানের আসর করলেন, অনেক মোটা টাকায় টিকিট বিক্রি করে পুরো টাকাটা শিশুদের জন্যে দান করা হলো। শাজাহান সুজা তাঁর ছবির প্রদর্শনী করলেন, প্রদর্শনী শেষে ছবিগুলি নিলামে বিক্রি করা হলো। স্থানীয় বিদেশীরা অবিশ্বাস্য দাম দিয়ে ছবিগুলি কিনে নিল, শাজাহান সুজার ছবি কিনলে নাকি টাকা খরচ করা হয় না, টাকা খাটানো হয়, ক'দিন পরে ছবিগুলি হয়তো লাখ লাখ টাকায় বিক্রি হবে। ছবি প্রদর্শনী থেকে অনেক টাকা উঠলো, পুরো টাকাটাই শাজাহান সুজা শিশুদের জন্যে দিয়ে দিলেন।

দরজায় টাকা শুনে উঠে দরজা খুলে দেয় রুমী, বাইরে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ ওর ভেতরটা চমকে ওঠে। হলে আশেপাশের দরজা থেকে অনেক ছেলে উকি দিয়ে দেখছে, পুলিশ এ সমাজে খুব ভয়াবহ জীব। পুলিশ অফিসার হাত বাড়ালেন, চিনতে পারছেন?

চিনতে পারলো রুমী, এক রাত হাজত বাসের সময় এই পুলিশ অফিসার তাকে জেরা করেছিলেন, তাকে অবিশ্বাস করে হাজতে পুরেছিলেন আবার তার কথা সত্যি হওয়ার পর নিজে গিয়ে লকআপ খুলে বের করে এনেছিলেন। রুমী হাত বাড়িয়ে বললো, চিনতে পারবো না। এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যাবো। আমার জীবনের প্রথম হাজত বাস।

ভদ্রলোক জোরে জোরে হাসলেন, তাই শুনে আশেপাশের সবাই বুঝলো ভয়ের কিছু নেই, যে যার নিজের কাজে ফিরে গেল। ভদ্রলোক রুমীর সাথে তার ঘরে ঢুকে এদিক সেদিক তাকালেন। চমৎকার ঘর, চমৎকার দৃশ্য ইত্যাদি বলে রুমীকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজে আরেকটা ধরিয়ে কাজের কথায় চলে এলেন। রুমী বুঝতে পেরেছে কি জন্যে এসেছেন, তবু নিজের কানে শোনার জন্যে অপেক্ষা করে রইলো।

মনে আছে আপনি হাজতে বসে আশফাক হাসানের কেসটা কিভাবে বলে দিয়েছিলেন?

মাথা নাড়ে রুমী।

আমি নিজে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। অবিশ্বাস্য।

চুপ করে থাকে রুমী। ভদ্রলোক একটু নিচু গলায় বললেন, আপনাকে আবার সাহায্য করতে হবে।

রুমী নড়েচড়ে বসে বলে, কি সাহায্য?

পুলিস ডিপার্টমেন্ট কিছুতেই বাচ্চাদের মর্ডারারকে ধরতে পারছে না। কোনদিকে এতটুকু চিহ্ন নেই। এতো চেষ্টা করা হচ্ছে আপনি কম্পনা করতে পারবেন না, কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না। আপনি যদি আগের মতো বলে দেয়ার চেষ্টা করেন, জাস্ট একটু ধরিয়ে দেবেন, কোন ধরনের ক্লু, জাস্ট ছোট একটা ক্লু...

রুমী আস্তে আস্তে বলে, আমি পারলে সত্যি বলতাম। আপনি না এলেও আমি চেষ্টা করতাম। ঠাট্টা করে বলে, অন্তত টাকাটার লোভে চেষ্টা করতাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আজ তিন বছর ধরে আমি আর পারি না। একেবারেই পারি না।

ভদ্রলোকের খুব আশাভঙ্গ হলো। মরিয়া হয়ে লুকিয়ে রুমীর কাছে এসেছিলেন তিনি। শিশু হত্যাকারীকে ধরার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু চেষ্টা করা হচ্ছে। পুলিশের ডি. আই. জি. নিজে নাকি সব ক'জন পীরের কাছে গিয়ে ধনী দিয়েছেন, কোনো লাভ হয়নি।

ভদ্রলোক যাবার সময় রুমীকে নিজের নাম আর ফোন নাম্বার দিয়ে গেলেন। যদি কোনভাবে কোনরকম হিন্দস পায় তাকে জানাতে যেন দ্বিধা না করে।

রুমী সে-রাতে অনেকক্ষণ ভাবলো ব্যাপারটা। তার যে কথাটা আগে মনে হয়নি তা নয়, এমন কি কিবরিয়া ভাইও একবার তাকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। পুরস্কারের টাকাটা এক লাখ হয়ে যাবার পর তার নিজেরও প্রচণ্ড লোভ হয়েছিল। তবু কিছুতেই সেই অন্ধকার জগতে ফিরে যেতে চায় না রুমী। যাদের অভিজ্ঞতা হয়নি তারা কোনদিন ওর ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না। এটা অনেকটা চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাপিয়ে পড়ার মতো, ড্রাইভার ট্রেনের ব্রেক কষে থামাতে পারবে কিনা জানা নেই। যতবার ঐ ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে ততবারই সে তার ভেতর থেকে ফিরে আসতে পারবে বলে

ভাবতে পারেনি। ব্যাপারটা এখন অতীত, তবু ওর বুকের ভেতর ভয়টুকু রয়ে গেছে, প্রচণ্ড অশ্রীরী ভয়, সেভয়ের রাজ্যে আর ফিরে যেতে চায় না রুমী।

ঘুরেফিরে একসময়ের সর্বনাশা ক্ষমতার কথা মনে হতে থাকে ওর। শিশু হত্যাকারীদের ওপর সবার মতো সে নিজেও এমন বিরক্ত হয়ে উঠেছে যে বলার নয়, আরও কিছুদিন এরকম চললে ও সত্যিই চেষ্টা করে দেখবে হত্যাকারীর মনের ভেতর প্রবেশ করা যায় কিনা। এখন সে তা পারে না, ক্ষমতাটা শেষ হয়ে গেছে, তবু চেষ্টা করাটা ওর কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে জানে হয়তো তার ভেতরে কোথাও এখনো ক্ষমতাটা লুকিয়ে আছে, চেষ্টা করলেই বের হয়ে আসবে। তাই যদি হয়, তবে শিশুগুলির মৃত্যুর জন্যে সে-ও খানিকটা দায়ী হবে।

চিৎকার করে উঠে বসে রুমী। স্বপ্নে দেখেছে ছোট একটা শিশু প্রচণ্ড ভয় পেয়ে আতর্জন করছে। যন্ত্রণায় ওর সারা মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে, চোখ দুটি যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দেখতে দেখতে ছোপ ছোপ রক্তে ওর মুখ ভরে উঠেছে। শিশুটি তখনো চিৎকার করে যাচ্ছে, অসহায় ব্যাকুল চিৎকার, দেখে বুক ফেটে যেতে চায়।

ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসে রুমী, দরদর করে ঘামছে সে, বুকের ভেতর ধক্ ধক্ করছে। কি ভয়ানক! ইশ! কি ভয়ানক স্বপ্ন!

রুমীর বুকের ভেতর বহু পুরোনো চাপা একটা ভয় বাসা বাঁধতে থাকে, ও জানে এটা শুধু স্বপ্ন নয়—স্বপ্নের থেকে অনেক বেশি।

পরদিন ভোরে খবরের কাগজে বড় বড় করে লেখা হলো, আরও একটি হতভাগ্য শিশু। পাশেই শিশুটির রক্তাক্ত ছবি। রুমী চিনতে পারলো একেই সে দেখেছে গতরাত্রে।



www.banglabook.com

নয়

সারাদিন ধরে প্রস্তুতি নিল রুমী, আজ রাত্রে সে শিশু হত্যাকারীকে খোঁজার চেষ্টা করবে। আগে কখনো এ ধরনের চেষ্টা করেনি ও, পারবে কিনা তাও জানে না, কিন্তু আগের রাত্রে সেই হতভাগ্য শিশুটিকে দেখার পর ওর মনে হয় ব্যাপারটা সম্ভব হতেও পারে। ওর প্রস্তুতির বেশির ভাগই মানসিক। শানুকে একটা লম্বা চিঠি লিখলো, অনেক দিন দেখা হয় না, সময় পেলেই বেড়াতে যাবে, ভাগনেরা সব কেমন আছে—এই ধরনের কথাবার্তা। দুপুরে অনেকক্ষণ ধরে গোসল করে পরিষ্কার কাপড় পরলো সে। খাওয়ার পর ভালো এক প্যাকেট সিগারেট কিনে আনলো দোকান থেকে। লাইব্রেরির কটা বই ছিল তার কাছে, সব সময়ে পাওয়া যায় না অনেক কষ্ট পেয়েছে সে, তবু সেগুলি কি ভেবে ফেরত দিয়ে এলো। একটা ছেলের কাছ থেকে দশ টাকা ধার করেছিল সেদিন, টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে এলো। পুলিশ অফিসারকে জানাবে কিনা ভেবে না পেয়ে, না জানানোই ঠিক করলো। রাত্রে যদি ওর কিছু একটা হয়ে যায় সেটা ওর পাশের রুমের ছেলেটি জানতে পারবে। আজকাল ভোরে নাস্তা করতে যাওয়ার সময় রোজ তাকে ডেকে নিয়ে যায়।

সন্ধ্যে হয়ে এলে বুকের ভেতর যেন কেমন করতে থাকে রুমীর। কে জানে শেষ পর্যন্ত কিছু হবে কিনা। সে একটু পর পর নিজের মনের ভেতর খুঁজে দেখে অশুভ কোনো অনুভূতি জেগে উঠেছে কিনা। আজ সারাদিনই ওর বুক একটা চাপা ভয়, সবকিছুকেই ওর অশুভ মনে হয়।

একটু সকাল সকাল খেয়ে নেয় রুমী। কারো সাথে কথা না বলে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। বাতি নেভানোর আগে একটা সিগারেট ধরায়, অন্ধকারে সিগারেট খেয়ে সে মজা পায় না। কোনরকমে সিগারেট শেষ করে বাতি নিভিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বিছানায় বসে। বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শিশুগুলির কথা ভাবতে থাকে সে। যে মানুষ এরকম অবোধ শিশুদের মারতে পারে সে না জানি কিরকম! কে জানে হয়তো এটাও কোনো ধরনের প্রেত-সাধনা—রুমীর বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে। সাথে সাথেই তার টুপি মাথায় সেই বৃদ্ধটির কথা মনে পড়ে, সে তাকে বুঝিয়েছিল মানুষের ভেতর কত ক্ষমতা আছে তা সে জানে না, জানলে পৃথিবী অন্যরকম হয়ে যেতো। সে নিজেই সাহস দেয় অতীতে যা ঘটেছে তা অতীতেই থাকবে, ভবিষ্যতে আর ঘটতে দেবে না।

...লুসি ইন দা স্কাই...ডায়ম ...হঠাৎ করে রুমীর ভেতরে একটা ইংরেজী গানের সুর ভেসে ওঠে। মুহূর্তে সোজা হয়ে বসে রুমী। কেউ একজন গান গাইছে। কে লোকটা? হঠাৎ গান বন্ধ হয়ে তীব্র গালাগালি শুরু হয়ে যায়, সে-ভাষা বুঝতে পারে না রুমী কিন্তু অনুভূতিটা বুঝতে পারে। প্রচণ্ড ঘৃণা কারো ওপর, প্রচণ্ড ঘৃণা! চোখ বন্ধ করে দেখার চেষ্টা করে রুমী, কিছু দেখতে পায় না। সমস্ত মনপ্রাণ একত্র করে সে চেষ্টা করতে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ একটা দুটো ছবি ভেসে ওঠে, কিন্তু তেমন পরিষ্কার হয় না। মনে হচ্ছে সে দ্রুত ভেসে যাচ্ছে, যেন হাওয়ায় ভর করে—একটা দোকান, একটা লাইট পোস্ট, ঠেলা গাড়িতে শুয়ে আছে একজন—আবার অন্ধকার।

...আর একটা হলেই হয়। শালারা এতো সাবধান হয়ে গেছে। আবার অশ্রাব্য গালি, এবারে বাংলায়। রুমী বুঝতে পারে লোকটা ছোট বাচ্চার কথা বলছে। সে ঠিক লোকটাকেই পেয়েছে। এতোক্ষণ ভাবছিল বিদেশী, কিন্তু না বিদেশী নয়। সারা মনপ্রাণ একত্র করে মানুষটার ভেতরে মিশে যাবার চেষ্টা করে রুমী পারে না, বারবার লোকটা ওর কাছ থেকে যেন ফস্কে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সে হাল ছাড়ে না, প্রচণ্ড একাগ্রতা নিয়ে পেছনে লেগে থাকে।

আগুন্তে আগুন্তে লোকটাকে অনুভব করতে পারে সে, দেখতে পায় লোকটার চোখ দিয়ে, ভাবনাগুলি জানতে পারে। গাড়ি চালাচ্ছে রুমী, চোখ দুটি ঘুরছে রাস্তার দুপাশে, ছোট শিশু খুঁজছে সে। আপন মনে গান গাইছে, লুসি ইন দা স্কাই উইথ ডায়মণ্ড, ঘুরেফিরে একটা লাইনই গাইছে সে অনেকক্ষণ ধরে। কি গান এটা? লোকটাকে দেখতে পায় না ও, তার চোখ দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখে, কিন্তু তাতে লাভ কি? লোকটাকে ওর দেখা দরকার।

পারলো না রুমী, হঠাৎ করে সে লোকটার অনুভূতি হারিয়ে ফেললো। কিছুক্ষণ লাগলো ওর বুঝতে ও কোথায় আছে। নিজের বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করে, আগে কখনো সে এত ক্লান্তি অনুভব করেনি। কে জানে, জোর করে চেষ্টা করছে বলই হয়তো এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবু ওর বুকের ভেতরটা হালকা হয়ে যায়। লোকটাকে পেয়েছে সে, এবারে তার পরিচয় বের করতে হবে। লোকটার গাড়ি আছে, অন্ধকারে বোঝা যায় না কি রঙ। বিদেশী ভাষায় কথা বলতে পারে সে, ইংরেজী গান গায় লুসি ইন দা স্কাইন না কি যেন। কি গান এটা? বেশিক্ষণ ভাবতে পারে না রুমী, মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়ে সে।

পরদিন ফোন করে পুলিশ অফিসারকে পেল না রুমী, কি কাজে জানি রাজশাহী গেছেন, দুদিন পর ফিরে আসবেন। একটু আশাভঙ্গ হলো তার, ভদ্রলোক শুনলে খুশি হতেন। অবশ্যি এখন পর্যন্ত সে বিশেষ কিছু জানতে পারেনি, লোকটা কোথায় থাকে বের করতে হবে, কি রকম চেহারা কি নাম সব জানতে হবে।

রাত গভীর হয়েছে। লোকটা আবার গাড়ি নিয়ে বের হয়েছে। লাল রঙের গাড়ি রুমী দেখতে পেয়েছে আজ। লোকটা গাড়ি চালায় খুব বেপরোয়াভাবে। প্রতিবার একটা রিকশা পার হয় আর কুৎসিত গালি দেয় রিকশাওয়ালাকে। লোকটা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে একটা বাচ্চার জন্যে, অপেক্ষা করতে পারছে না আর। গান গাইতেও মনে নেই, চোখ দুটো শুধু নড়ছে দুই পাশে।

কি একটা কাজ আটকে আছে ওর, রুমী অনেক চেষ্টা করেছে বুঝতে পারলো না। একটা বাচ্চা না পেলে সে কাজটা শেষ করতে পারছে না। অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিচ্ছে বাচ্চাদের, মানুষ বলেই ভাবে না, কুকুর বেড়ালের মতো দেখে সে ওদের। জীবন সার্থক করে দিচ্ছে সে শিশু গুলির, সেজন্যে ওদের খুশি হওয়া উচিত। মরে তো এমনিতেই শেষ হবে, একটা কাজে লাগলে ক্ষতি কি?

তৃতীয় রাত। ঘরের বাইরে গেল না রুমী, অন্ধকার ঘরে বসে মদ খেলো সারাক্ষণ। মন মেজাজ খুব খারাপ, মদ খেয়ে আরও খারাপ হয়ে গেল। বাসর ঘরে টেলিফোন বেজেই চললো, সে গিয়ে ধরলো না পর্যন্ত।

চতুর্থ রাত। কি আনন্দ! কি আনন্দ! বাচ্চা পেয়েছে সে একটা, ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে এখন। কাল ভোর থেকেই কাজ শুরু করে দেবে। অনেকদূর যেতে হয়েছে আজ, শহরের সবাই এতো সাবধান হয়ে গেছে যে বলার নয়। তার এতগুলি কায়দা ছিল বাচ্চা ধরে আনার তবু কোনটাই কাজে লাগছে না আজকাল। দূরে গ্রামের দিকে শিশুগুলি এখনো সাবধান হয়নি, সেখান থেকেই ধরে এনেছে সে। সবার এটা নিয়ে এতো বাড়বাড়ি করার দরকার কি সে বুঝতে পারে না। সে তো খারাপ কিছু করছে না, বাচ্চাগুলি তো এমনিতেই মরে ভূত হয়ে যেতো, এখন তবু একটা কাজে লাগছে। লোকটা হালকা সুরে গান গাইতে গাইতে ঘুরে বেড়াতে থাকে। বাথরুমে গেল, রুমী প্রস্তুত হয়ে নিল সাথে সাথে, বাথরুমে আয়নায় চেহারা ভালো করে দেখে নিয়ে মনে রাখতে হবে। চেহারার থেকে বেশি দরকার লোকটার পরিচয়, বাসার ঠিকানা।

বাথরুমে বাতি জ্বালিয়ে লোকটা আয়নার দিকে তাকালো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিজেকে দেখছে।

লোকটাকে আগে দেখেছে রুমী, কিন্তু মনে করতে পারছে না কোথায় দেখেছে। কে? কে লোকটা? কে?

হঠাৎ চিনতে পারে রুমী, হতবাক হয়ে যায়, শাজাহান সুজা।

পুলিস অফিসার গভীর হয়ে মাথা নাড়লেন, আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে এখন।

রুমী জোর দিয়ে বললো, আমি স্পষ্ট দেখেছি শাজাহান সুজাকে। আমি ওকে ভালো করে চিনি, ওর একটা লাল গাড়িও আছে।

কিন্তু ওর বাসায় আমি কিছু পাইনি, বললেন পুলিশ অফিসার। সবকিছু তন্নতন্ন করে দেখেছি। ভীষণ খেপেছে শাজাহান সুজা, ডি. আই. জি.কে ফোন করেছে, এখন আমার চাকরি যাবার দশা।

রুমী মাথা নেড়ে বললো, আমি স্পষ্ট দেখেছি, বিশ্বাস করুন আমাকে।

কিন্তু কি করবে ও বাচ্চাকে মেরে?

জানি না। কি একটা খুব নাকি জরুরী দরকার। কি কাজ কিছুতেই বুঝতে পারলাম না।

পুলিস অফিসার মুখ গভীর করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। একটু পরে বললেন, হয়তো এতদিন পরে আপনার ক্ষমতাটা কমে আসছে, ঠিক করে বলতে পারছেন না আজকাল...

উত্তেজিত হয়ে বাধা দেয় রুমী, কক্ষণো না। আমি ঠিক বুঝতে পারি কখন কি হচ্ছে।

কিন্তু আমাদের হাত-পা বাঁধা। শাজাহান সুজাকে হাতেনাতে ধরতে না পারলে কিছুতেই প্রমাণ করা যাবে না। আপনার কথার ওপর ভরসা করে ওকে তো অ্যারেস্ট করতে পারি না।

রুমী এবারে রেগে ওঠে। চেষ্টা করে রাগটা চেপে রাখতে, তবু ওর গলার স্বরে সেটা প্রকাশ হয়ে যায়, আপনিই নিজে গিয়ে আমাকে অনুরোধ করলেন একটা কিছু আভাস দিতে। এখন আমি বলে দিচ্ছি লোকটা কে তবু আমার কথা বিশ্বাস করছেন না।

বিশ্বাস করছি না কে বললো? ভদ্রলোক বাধা দিলেন, আপনার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে শাজাহান সুজাকে চোখে চোখে রাখলেই সে ধরা পড়বে।

কতদিন চোখে চোখে রাখবেন?

যতদিন সে আবার একটা কিছু না করছে।

মানে? আর সে যে আরেকটা বাচ্চা ধরে এনেছে। তাকে যদি...

আমি ওর বাসা দেখেছি, কোনো বাচ্চা নেই।

আমি বলছি আছে, আমাকে নিয়ে চলুন।

তা হয় না। ভদ্রলোক নরম গলায় বললেন, শাজাহান সুজা খুব ক্ষমতালী লোক।

আপনি বুঝবেন না, ওকে হাতেনাতে ধরলেও ওর নামে কেস করা খুব মুশকিল হবে।

আপ্তে আপ্তে বললো রুমী, তার মানে আপনি ঐ বাচ্চাটাকে শাজাহান সুজার হাতে মরতে দেবেন?

ভদ্রলোক দুর্বল গলায় বললেন, ওর বাসায় কোনো বাচ্চা নেই।

রুমী টেবিলে কিল মেরে বললো, একশোবার আছে। কাল পরশু যখন বাচ্চাটাকে রাস্তায় মরে পড়ে থাকতে দেখবেন তখন বিশ্বাস করবেন।

আমাদের ঐ একটা চন্দ। আপনার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে শাজাহান সুজাকে কোথাও না কোথাও মৃতদেহটা ফেলতে হবে। তখন হাতেনাতে ধরে...

রুমী লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, চিৎকার করে বলে, তার মানে ঐ ছেলেটাকে জান দিতে হবে ওকে ধরার জন্যে, আপনারা জেনেশুনে শিশুটিকে মরতে দিচ্ছেন?

ব্যস্ত হবেন না, আমার কথা শুনুন। ভদ্রলোক রুমীকে হাত ধরে বসিয়ে দিলেন। ব্যাপারটা এইভাবে দেখুন, ছেলেটা হয়তো মারা যাবে, তবু আমরা ওকে ধরতে পারবো, এছাড়া তাকে ধরার আর কোনো উপায় নেই। আপনার কথা শুধু আমিই বিশ্বাস করছি, অন্য কেউ বিশ্বাস করবে না। শুধু তাই নয় আপনি যদি অন্য কাউকে এটা বলতে যান, আপনি নিজে সমস্যায় পড়ে যাবেন। শাজাহান সুজা চলিমদ্দি, কলিমদ্দি না, শাজাহান সুজা হচ্ছে শাজাহান সুজা, দেশের সম্পদ। ওই বাচ্চাটা মারা গিয়ে হয়তো আরও দশটা বাচ্চার জান বাঁচাবে।

মাথা নাড়ে রুমী, আমি কিছুতেই আপনার কথা মানতে পারবো না। এক হাজার পুলিশ দিয়ে ওর বাড়ি ঘেরাও করুন, হারামজাদাকে ধরে গরুর মতো পিটিয়ে ওর মুখ থেকে কথা বের করুন...

আপনি এখনো অনেক ছেলেমানুষ। দুনিয়া বড় কঠিন জায়গা। পকেটমারকে ধরে পেটানো যায়, যদিও সে পকেট মারছে ছেলেমেয়েদের খাওয়ানোর জন্যে। শাজাহান সুজারও ছাড়া পেয়ে যায়, যদিও খুন করছে নিছক আনন্দের জন্যে।

ঠিক তক্ষুণি একটা টেলিফোন এলো। রুমী পুলিশ অফিসারের কথা শুনে বুঝতে পারে শাজাহান সুজার বাসায় গিয়েছিলেন বলে কৈফিয়ত তলব করা হচ্ছে। খবরের কাগজে খবর চলে গিয়েছে, কাল ভোরে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। ভদ্রলোক মুখ কালো করে শুনে গেলেন। কোন খবরের ওপর ভরসা করে শাজাহান সুজার বাসায় গিয়েছিলেন বলার উপায় নেই। আমতা আমতা করে বললেন, সাভারের রাস্তায় একটা লাল গাড়ি দেখা গিয়েছিল, শাজাহান সুজার গাড়িও লাল...

ফোনের অন্য পাশ থেকে একটা অটোহাসির মতো শব্দ ভেসে এলো। রুমী প্রায় দু'হাত দূরে বসে স্পষ্ট শুনলো ওপাশ থেকে বলছে, তাহলে ফায়ার ব্রিগেডের লোকজনকে অ্যারেস্ট করো না কেন? ওদের গাড়িও তো লাল।

ভদ্রলোক ফোন রেখে বললেন, আজ কালের ভেতর এটার কোনো কিনারা না হলে আমার গারো পাহাড়ে পোস্টিং হয়ে যাবে।

ক্ষুব্ধ হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ালো রুমী, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে সেও খানিকটা বুঝতে পেরেছে কেন এখন শাজাহান সুজাকে ধরার উপায় নেই। ওর মনে পড়ে শ্রেত উপাসকের দলেরা হাতেনাতে ধরা পড়লে শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। তবুও চুপচাপ একটা শিশুকে মরতে দিতে কিছুতেই ওর মন সায় দিচ্ছে না।

রুমী খেয়াল করেনি কখন সে হাঁটতে হাঁটতে শাজাহান সুজার বাড়ির কাছে চলে এসেছে। সম্ভ্রান্ত এলাকা, ঝকঝকে বাসাগুলি আশ্চর্য রকম চুপচাপ। প্রায় বাসাতেই বড় বড় কুকুর, ঘেউ ঘেউ করে ঐশ্বর্যের কথা জানিয়ে দেয়।

শাজাহান সুজার বাড়িটি একতলা, ছিমছাম। বাইরে বড় লোহার গেট, সেখানে মস্ত তাল ঝুলছে। একমুহূর্তের জন্যে দাঁড়ালো রুমী। কে জানে হয়তো এর ভেতর এখন শাজাহান সুজা বাচ্চাটিকে হত্যা করছে। ভাবতে ভাবতে একটা শিশুর তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেল রুমী। চমকে ঘুরে তাকায় সে, কেউ নেই। চিৎকারটি সে শুনতে পায়নি, অনুভব করেছে। কিন্তু এত স্পষ্ট আর জীবন্ত অনুভূতি এর আগে কখনো হয়নি।

চলে যাচ্ছিল রুমী, হঠাৎ ধমকে দাঁড়ালো। শাজাহান সুজার গলা শুনতে পেল সে, দেখি কত সহ্য করতে পারিস হারামজাদা! রুমীর মনে হলো ওর কানের কাছে চিৎকার করে বলছে শাজাহান সুজা। এত জীবন্ত গলার স্বর যে রুমীর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

আবার শাজাহান সুজার হিংস্র চিৎকার শুনতে পেল রুমী, আর সাথে সাথে একটা শিশুর প্রাণফাটা আর্তনাদ। রুমীর চোখের সামনে একটা শিশুর রক্তমাখা মুখ একমুহূর্তের জন্যে ভেসে ওঠে। ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় ছুটতে থাকে সে, আর সহ্য করতে পারে না। কিন্তু ছুটে গিয়েও রেহাই পায় না সে, শিশুটার প্রাণফাটা আর্তনাদ তাকে তাড়া করতে থাকে। পাগলের মতো ছুটতে থাকে রুমী, আর কি ভাগ্য তখনি খালি রিকশা পেয়ে যায়। কোনমতে উঠে বলে, তাড়াতাড়ি চলো।

কোথায়?

যেখানে খুশি। রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে প্রাণপণে রিকশা ছুটিয়ে চলে।

অনেকক্ষণ পর সংবোধিত হয়ে পায় রুমী। অনেক ঘুরে ফিরে সে হলের কাছে এসে পৌছেছে। বাচ্চাটার আর্তনাদ আর সে শুনতে পাচ্ছে না কিন্তু তাতে লাভ কি? সে ভুলবে কি করে?



সারা বিকেল সে চুপচাপ বসে ভেবেছে। ঘুরেফিরে বারবার ওর তিন বছর আগের সেই টুপি মাথায় শান্ত মতন বুড়ো লোকটার কথা মনে পড়েছে। তাকে বলেছিল, বাবা, তোমার সাহস থাকলে বলতাম তুমি এসব লোকদের শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও। তখন তার সাহস ছিল না, যে কোনভাবে এই যন্ত্রণাদায়ক ক্ষমতার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন অন্য ব্যাপার, সে নিজেই এখন তার ভেতর সেই পুরোনো ক্ষমতা জাগিয়ে তুলেছে। এবারে সে চেষ্টা করে দেখতে পারে না? শাজাহান সুজাকে একটা শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে পারে না? এতে শিশুদের আত্মা যদি একটু শান্তি পায়, সেটুকুই লাভ।

কথাটা যতোই ভাবে ততোই তার স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকে। আস্তে আস্তে নিজের ভেতরে একটা অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসের অস্তিত্ব অনুভব করে সে। সন্ধ্যায় খেতে বসে থেকে থেকে তার মুখের মাসপেশী শক্ত হয়ে কেমন একটা কঠোর ভাব ফুটে ওঠে। সামনের চেয়ারে পরিচিত ছেলেটি রুমীকে দেখে অবাক হয়ে বললো, কি রে রুমী, কি হয়েছে তোর?

মুহূর্তে মুখের মাসপেশী শিথিল করে হেসে বললো, না কিছু না।

মুখ এমন করে রেখেছিস যেন কাউকে মারবি।

একটু হাসলো রুমী, কাকে মারবে? ও কি জানে মারলে তার কি শাস্তি হবে?

শান্ত হয়ে নিজের ঘরে বিছানায় বসে আছে রুমী। ঘরের বাতি বন্ধ, খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো বিছানার ওপর এসে পড়েছে। আজকাল তার আর ভয় হয় না, নিজের ক্ষমতার ওপর একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে। অবশ্যি আজ দুপুরে সে যখন শাজাহান সুজার বাসার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল তখন তার নিজের ইচ্ছার ওপর কোনো হাত ছিল না। সে শাজাহান সুজার হিংস্র চিৎকার আর বাচ্চাটির আর্তনাদ কিছুই শুনতে চাচ্ছিল না। তবু তাকে শুনতে হয়েছে। পুরো অনুভূতিটা এতো তীব্র আর এতো জীবন্ত ছিল যে তার সহ্য করা পর্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। কে জানে খুব কাছাকাছি থাকলে হয়তো এরকম তীব্র অনুভূতিই হয়।

চোখ বন্ধ করে, মনপ্রাণ অনুভূতি একত্র করে শাজাহান সুজার ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে রুমী।

...শাজাহান সুজা ছবি আঁকছে—যন্ত্রণাকাতর ভীত একটা শিশুর মুখ। সামনে তার মডেল একটা ছোট শিশু হাত-পা শক্ত করে চেয়ারের সাথে বাঁধা। একটু পর পরই সে একটা বড় ধারালো ছুরি দিয়ে ভয় দেখিয়ে শিশুটার এখানে সেখানে খোঁচা মারছে। প্রাণপণে আর্তনাদ করে ওঠে শিশুটা, তীক্ষ্ণ চোখে সে তখন শিশুটাকে লক্ষ্য করে। তারপর তুলিতে রঙ লাগিয়ে ছবিতে মন দেয়। ছবিতে শিশুটির চেহারা এই শিশুটির মতো নয়। সে ইচ্ছা করেই কোনো নির্দিষ্ট শিশুর চেহারা নেয়নি, শুধু তাদের যন্ত্রণার অভিব্যক্তিটি ধরার চেষ্টা করেছে। আশ্চর্য রকম জীবন্ত এই ছবিটি, হঠাৎ দেখলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মুহূর্তের জন্যে থেমে যেতে চায়। শাজাহান সুজার ছবি আঁকা শেষ হয়ে গেছে, এখন সে খুব সুন্দর কীট

জিনিস দেখে নিতে চায়। বাড়তি আলো লাগিয়েছে আজ, একটা ক্যামেরা রেখেছে বাচ্চাটির যন্ত্রণাকাতর মুখের ছবি তুলতে। যে অভিব্যক্তি তার আঁকা ছবিতে ফোটানোর চেষ্টা করেছে ক্যামেরার ফিল্মে তা ধরা পড়ে না, তবু শিশুগুলির ছবি তুলেছে সে, কে বলতে পারে হয়তো পরে কাজে লাগবে।

ছবিটির এখানে সেখানে তুলির একটি দুটি পৌচ দিয়ে মাথা সরিয়ে দেখে শাজাহান সুজা। মুখে ওর পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু থেকে থেকে তার ভেতরে একটা দুশ্চিন্তা এসে উকি দিচ্ছে। পুলিশ অফিসার কি করে তাকে সন্দেহ করলো? ভাগিস্য জানালা দিয়ে সে পুলিশের জীপটা দেখেছিল, বাচ্চাটির মুখ শক্ত করে বেঁধে আলমারির পেছনে গোপন জায়গাটাতে লুকিয়ে রাখার মতো সময় পেয়েছিল সে। কিন্তু পুলিশ অফিসার বুঝলো কি করে? সবচেয়ে অবাক লাগে যখন হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় কেউ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ভেতরে ভেতরে হঠাৎ অন্য কেউ যেন কথা বলে ওঠে। কে জানে এসব মত শিশুদের আত্মা মিছিল করে তাকে মারতে আসে কিনা।

এসব ভেবে শাজাহান সুজার হাসি পেয়ে যায়, কিন্তু ছবিটির দিকে তাকিয়ে আবার সে গম্ভীর হয়ে পড়ে। ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবি। এটা শেষ করে মারা গেলেও তার দুঃখ নেই। কি আনন্দ! নিখুঁত একটা ছবি এঁকে এতো আনন্দ সে জানতো না। নিখুঁত ছবি কীট আছে পৃথিবীতে? একেই বোধ হয় সৃষ্টি বলে—সৃষ্টি! বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে ঈশ্বর বুঝি এরকম আনন্দ পেয়েছিলেন। সে যোটা করেছে সেটাই তো সৃষ্টি—অসাধারণ সৃষ্টি। যুগ যুগ ধরে মানুষ জানবে যন্ত্রণা কাকে বলে, মৃত্যুভয় কাকে বলে। যারা যন্ত্রণাকে কোনদিন অনুভব করেনি তারা যন্ত্রণাকে অনুভব করবে। জীবন্ত মানুষ মৃত্যুর আগেই পারবে মৃত্যুকে অনুভব করতে।

শাজাহান সুজার চোখে পানি এসে যায়। এরকম মহান একটা সৃষ্টির জন্যে না হয় কীটা প্রাণ গেলই। আর সে তো খুঁজে খুঁজে গরীব, দুঃখী, ভাগ্যহীন শিশুদেরই বেছে নিয়েছে। এরা বড় হলে তো অনুভূতিহীন নির্বোধ মানুষ হয়েই বড় হতো, ক্ষুধার অনুভূতি ছাড়া আর কি অনুভূতি আছে এদের? সুন্দর কিছু দেখার, অনুভব করার ক্ষমতা এদের কখনো হতো না। পৃথিবীটা তো এদের জন্যে তৈরি হয়নি, এরা কীট পতঙ্গের মতো জন্মায়, কীট পতঙ্গের মতো মারা যায়। অল্প ক'জন মানুষ শুধু প্রতিভা নিয়ে জন্মায়, ওদের দেখার চোখ থাকে, বোঝার ক্ষমতা থাকে, অনুভব করার শক্তি থাকে, পৃথিবীটা তো তাদের জন্যেই। অন্যেরা শুধু পেটের ক্ষুধা, বড় জোর দেহের ক্ষুধা নিয়ে বেঁচে থাকে। ওদের বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার মাঝে পার্থক্য কি?

অপলক দৃষ্টিতে ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকে শাজাহান সুজা, ওর মুখ কোমল হয়ে আসে। চোখ থেকে মমতা যেন বৃষ্টির ফোঁটার মতো গড়িয়ে পড়ে। এরকম পরিতৃপ্তি ওর জীবনে আর কখনো আসেনি। ছবিটির দিকে তাকালে মনে হয় যন্ত্রণা কাতর একটা শিশুর মুখ, ভালো করে দেখলে চোখে পড়ে শুধু যন্ত্রণা নয় আরও কিছু আছে এতে। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে ছোট একটা শিশু যখন তার যন্ত্রণাকে ভুলে গিয়ে ভাগ্যের কাছে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত হয় তখন তার চোখে মুহূর্তের জন্যে যে বিচিত্র দৃষ্টি ফুটে

ওঠে, এটি সেই মুহূর্তের ছবি। যন্ত্রণা যখন ভীতির রূপ নেয়, আশা যখন ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে, সুখ দুঃখ যখন অর্থহীন হয়ে যায় এটি ঠিক সেই পরিবর্তনের মুহূর্ত।

ছবি আঁকা শেষ হয়েছে। তুলিটা রেখে দিয়ে সে একটু পিছিয়ে এসে দাঁড়ায়। আহা! কি ছবি! ঘরের আলোগুলি একটু সরিয়ে দেয়, অন্য দিক থেকে আলো এসে পড়ায় ছবিটা একটু অন্যরকম লাগতে থাকে। জিভ দিয়ে একটা আনন্দের শব্দ করলো শাজাহান সুজা।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল বাচ্চাটা, এবারে হঠাৎ যন্ত্রণার অস্ফুট একটা শব্দ করলো। শাজাহান সুজা ভুরু কঁচকে বাচ্চাটার দিকে তাকায়। সে ভুলেই গিয়েছিল বাচ্চাটার কথা। এর প্রয়োজন শেষ, পারলে সে ছেড়েই দিত বাচ্চাটাকে। তেলাপোকা মারতেও তো খারাপ লাগে, আর এ তো মানুষের বাচ্চা! কিন্তু ছাড়তে পারবে না সে, জানাজানি হয়ে যাবে তাহলে। মরার আগে একেকটার গায়ে কি ভয়ানক শক্তি এসে যায়, শাজাহান সুজার মনের আনন্দটা বিরক্তিতে ম্লান হয়ে আসে। কম ঝামেলায় কিভাবে বাচ্চাটাকে মারা যায় ভাবতে বসলো সে। মরার পর এটাকে আবার বাইরে নিয়ে ফেলে আসতে হবে, কে জানে ঐ মাথা খারাপ পুলিশ অফিসার আবার তার ওপর পাহারা বসিয়ে রেখেছে কিনা। তাহলে সে এটাকে এখন বাইরে নিয়ে ফেলতেও পারবে না। হয়তো কেটে টুকরো টুকরো করে ছোট ছোট প্যাকেটে ভরে... ভাবতেই শাজাহান সুজার মন বিরক্তিতে বিধিয়ে ওঠে।

মনের এত পরিতৃপ্তির ভাবটা এই বাচ্চাটার জন্যে নষ্ট হয়ে গেল। শাজাহান সুজা এগিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড একটা লাথি মারে বাচ্চাটাকে। এক লাথিতে মরে গেলেও চুকে যেতো, মরেও না শালার বাচ্চা! বাচ্চাটা প্রচণ্ড লাথি খেয়েও কেন জানি এবারে ডুকরে কেঁদে উঠলো না, হয়তো বুঝতে পেরেছে এখন ওকে কি করা হবে। অদ্ভুত বোবা একটা দৃষ্টিতে শাজাহান সুজার দিকে তাকিয়ে রইলো সে, দেখে আরও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তার।

ফ্রিজ খুলে একটা বিয়ারের বোতল বের করে আনতে হলো তাকে। সোফায় বসে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে থাকে কি করা যায়।

এদিকে মনপ্রাণ এক করে শাজাহান সুজার ওপর নিজের প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছে রুমী, ও জানে না কি করতে হয়, কি করবে কোনো ধারণা নেই। প্রথমে চেষ্টা করছে শাজাহান সুজার অস্তিত্ব থেকে নিজের অস্তিত্ব আলাদা করে রাখতে। প্রথম প্রথম পারছিল না, বারবার মনে হচ্ছিল সে নিজেই শাজাহান সুজা। আস্তে আস্তে সেটা সম্ভব হয়েছে, এখন শাজাহান সুজার অস্তিত্বের মাঝে থেকেও সে আলাদা হয়ে আছে। শাজাহান সুজার অস্তিত্বে বসে থেকে নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে সে। কোনো লাভ হচ্ছে না, শাজাহান একমনে বিয়ার খেয়েই চলছে। সমস্ত শক্তি একত্র করে সে ডাকার চেষ্টা করলো শাজাহান সুজাকে, কোনো লাভ হলো না। রুমী জানে একবার যদি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে তবে নিজের ওপর বিশ্বাস বেড়ে যাবে হাজার গুণ, সঙ্গে সঙ্গে শক্তিও বেড়ে যাবে অনেকখানি। তাই সে হাল ছাড়লো না, আবার ডাকলো শাজাহান সুজাকে—আবার ডাকলো—কিন্তু কোনো লাভ হলো না। শাজাহান সুজা সোফায় বসে চুক চুক করে বিয়ার খেয়েই চলছে।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বিশ্বাস সঞ্চয় করার চেষ্টা করে রুমী। নিশ্চয়ই পারবে সে, নিশ্চয়ই পারবে। তাকে পারতেই হবে, ছোট একটা শিশুর জীবন নির্ভর করছে তার ওপর। আর কোনো বিকল্প নেই, তাকে পারতেই হবে—পারতেই হবে। রুমী মনপ্রাণ

একত্র করে ডাকে শাজাহান সুজাকে, আর কি আশ্চর্য শাজাহান সুজা চমকে পিছনে তাকায়। কেউ নেই কোথাও অথচ কি আশ্চর্য! ও স্পষ্ট শুনলো কে যেন ওকে ডাকলো।

আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস আস্তে আস্তে বের করে দেয় রুমী। পেরেছে সে, শাজাহান সুজার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। এবার সে তাকে শিক্ষা দেবে, এমন শিক্ষা দেবে, যে তার আত্মা নরকে গিয়েও ভুলতে পারবে না।

শাজাহান সুজা!

শাজাহান সুজা আবার চমকে পিছনে তাকালো, আবার সে শুনেছে কেউ যেন তাকে ডাকলো। কি আশ্চর্য, আধ বোতল বিয়ার খেয়েই তার নেশা হয়ে গেল নাকি? শাজাহান সুজা বিয়ারের বোতলটা রেখে দেয়। এখনো অনেক কাজ বাকি, নেশা করার সময় হয়নি। কিন্তু ভেতরটা জানি কেমন করতে থাকে। অনেকদিন পর ভয় পেয়েছে সে।

শাজাহান সুজা, ডান দিকে তাকাও!

শক খাওয়া লোকের মতো চমকে ডান দিকে তাকালো শাজাহান সুজা। কেউ নেই।

বাম দিকে তাকাও, শাজাহান সুজা!

টেবিল ধরে কোনমতে বাম দিকে তাকায় শাজাহান সুজা। জানে কেউ নেই, তবু তাকিয়ে দেখলো। কি হয়েছে ওর? বাথরুমে গেল মাথায় পানি দিতে।

রুমী আস্তে আস্তে বললো, রেজরটা দেখো শাজাহান সুজা!

শাজাহান সুজা ভয়ে ভয়ে রেজরটার দিকে তাকায়।

হাত বাড়িয়ে তুলে নাও দেখি!

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাজাহান সুজা হাত বাড়িয়ে তুলে নেয় ওটা।

এবারে গলায় একটা পোঁচ লাগাও দেখি চাদ!

শাজাহান সুজা চিৎকার করে হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল রেজরটা। পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে।

দাঁতে দাঁত ঘষে রুমী, কোথায় যাবে তুমি বাছাধন?

শাজাহান সুজা ফ্রিজ খুলে ব্র্যান্ডির একটা বোতল বের করে ঢক ঢক করে দুই টোক খেয়ে নিল। মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে গেছে। বাচ্চাটাকে শেষ করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে। অনেক ধকল গিয়েছে শরীরের ওপর দিয়ে। রান্নাঘর থেকে একটা বড় ছুরি নিয়ে স্টুডিওতে চলে এলো সে।

একটু চমকে ওঠে রুমী, শাজাহান সুজাকে থামাতে হবে। মনপ্রাণ একত্র করে সে ওকে আদেশ দিতে থাকে, এক পা এগুবে না তুমি, দাঁড়াও যেখানে আছে।

হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শাজাহান সুজা। দরদর করে ঘামছে সে। সারা মুখ বক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ভয়ে।

তোমার আর কোনো শক্তি নেই, শাজাহান সুজা! প্রথমবার কথাটা এমনি বললো রুমী, দ্বিতীয়বার বললো অনেক জোর দিয়ে, তৃতীয়বার শুধু জোর দিয়ে নয়, বিশ্বাস নিয়ে।

শাজাহান সুজার মনে হলো সত্যিই তার কোনো শক্তি নেই। হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবার মতো অবস্থা এখন ওর। কোনমতে পা টেনে টেনে টলতে টলতে সোফায় এসে বসে পড়লো। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। ভয় পেয়েছে সে, প্রচণ্ড ভয়!

বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে রুমীও, প্রচণ্ড পরিশ্রম হচ্ছে ওর। একটি করে আদেশ দেয় শাজাহান সুজাকে আর সেটি কাজে খাটাতে গিয়ে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় তার। তৃষ্ণায় বুকুর ছাতি ফেটে যাচ্ছে ওর, কিন্তু উঠে পানির গ্লাসটা আনতেও ভয় পাচ্ছে সে যদি সেই সময়টাতে কিছু একটা করে ফেলে বাচ্চাটাকে, চোখ বন্ধ করে সে দেখে শাজাহান সুজাকে, মড়ার মতো পড়ে আছে সোফায়। হয়তো ওর শাজাহান সুজার বাসার কাছে চলে যাওয়া উচিত, তাহলে ওর এতো পরিশ্রম হবে না। কাছাকাছি থাকলে অনুভূতিটা অনেক তীব্র হয় আজ বিকেলেই সে দেখেছে। কাছে থাকলে আরও শক্ত করে শাজাহান সুজাকে ধরতে পারবে, আরও ভালো করে শিক্ষা দিতে পারবে।

উঠে দাঁড়ায় রুমী, ঢক ঢক করে গ্লাসের পানিটা শেষ করে পায়ে জুতো পরে নেয়। এতো রাতে রিকশা না পেলে তাকে হয়তো হেঁটেই যেতে হবে। জুতো পায়ে অনেক তাড়াতাড়ি হাঁটা যায়। শাজাহান সুজা এখন মরার মতো পড়ে আছে, কতক্ষণ পড়ে থাকবে কে জানে, এর মাঝে রুমীকে যতটুকু সম্ভব ওর কাছাকাছি চলে যেতে হবে। দরজা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে প্রায় ছুটতে থাকে সে।

অন্ধকার রাত। ঢাকা শহরেই রাতে এতো অন্ধকার নামতে পারে, গ্রামেগঞ্জে বনেবাদাড়ে না জানি এখন কত অন্ধকার। শহরে কেউ কখনো আকাশের দিকে তাকায় না। আকাশে চাঁদ ওঠে, আবার চাঁদ ডুবে যায়, কেউ খেয়াল পর্যন্ত করে না। রুমীর মনে আছে রাতে পড়াশোনা করে ঘুমোনের সময় একদিন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে কত বড় একটা চাঁদ। দেখে সে কি অবাক, কতদিন পরে চাঁদ দেখলো। সেই ছেলেবেলায় মায়ের কোলে বসে চাঁদ দেখতো, ওর মা গুনগুন করে কি যেন গান গেয়ে ওকে আদর করতেন। তারপর কতদিন হয়ে গেছে আর সে আকাশের দিকে তাকায়নি। আজ মাঝরাতে রিকশায় বসে চাঁদের দিকে তাকিয়ে ওর মায়ের কথা মনে পড়লো, কোথায় আছেন ওর মা? ওর ভেতরে কেমন একটা দুঃখ বোধ জেগে ওঠে, কি মানে আছে এই জীবনের? সে কি করছে এখন? কি প্রয়োজন তার এইসব করার?

ঠিক রাস্তার মোড়ে একজন লোক লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে—যে কেউ দেখে বলে দিতে পারবে এ পুলিশের লোক। পুলিশের সাদা পোশাকের লোকগুলিকে দেখতে সবসময় একরকম দেখায় কেন কে জানে। বোধহয় তারা একই ধরনের কাপড় পরে, একই ধরনের কাজকর্ম করে—হয়তো যেখানে তাদের কাজ শেখানো হয় সেখানে সবাইকে একই জিনিস শেখানো হয়। লোকটি সিগারেট টানতে টানতে খুব নিষ্পৃহ ভাবে রুমীর দিকে তাকালো যেন রুমী কে তাতে তার কিছুই এসে যায় না।

কি ভেবে সেখানেই নেমে পড়লো রুমী, পুলিশের লোকটাকে কিছু একটা বলে গেল হতো। রুমী একটু দ্বিধা করে, কে জানে হয়তো এ পুলিশের লোক নয়। রুমী চেষ্টা করলো লোকটি কি ভাবছে বুঝতে, কিন্তু পারলো না। আগেও দেখেছে স্বাভাবিক চিন্তা ভাবনাগুলো সে বুঝতে পারে না, শুধু খারাপ অশুভ কথাগুলিই শুনতে পায়।

একটু দ্বিধা করে জিজ্ঞেস করলো রুমী, আপনি কি পুলিশের লোক?

লোকটা হকচকিয়ে গিয়ে বললো, আপনি...আপনি কিভাবে জানলেন?

জানি না বলেই তো জিজ্ঞেস করলাম। আমি আন্দাজ করেছিলাম আপনারা কেউ কাছাকাছি থাকবেন। লোকটিকে আরও ঘাবড়ে না দিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললো সে। পুলিশ অফিসারের নাম করে বললো, সে তাঁকে খুব ভালো করে চেনে এবং তাঁর খবরের ওপর ভিত্তি করেই শাজাহান সুজার বাসার ওপর পাহারা বসানো হয়েছে। শুনে লোকটি একটু সহজ হলে রুমী বললো, আপনাকে আমার একটা উপকার করতে হবে।

কি উপকার?

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কিছু পুলিশ নিয়ে আসতে হবে। আপনাদের অফিসারকে আমার নাম বলে ফোন করলেই হবে।

লোকটি চোখ কপালে তুলে বললো, পুলিশ? সর্বনাশ! এটা খুব গোপন ব্যাপার, আমি এখানে আছি সেটা পর্যন্ত ডিপার্টমেন্ট জানে না।

জানি। রুমী ঠাণ্ডা গলায় বললো, গোপন ব্যাপার আর গোপন নেই। আমি শাজাহান সুজার বাসায় ঢুকছি ওকে হাতেনাতে ধরার জন্যে।

লোকটি অবাক হয়ে রুমীর দিকে তাকালো, এর মাথা খারাপ না আর কিছু! কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ সে রুমীকে ভীষণ চমকে উঠে চোখ বন্ধ করে ফেলতে দেখলো। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শুনেছে রুমী—চোখ বন্ধ করে দেখতে পায় শাজাহান সুজা ছুরি হাতে বাচ্চাটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বেঁচে থাকার আদিম প্রবৃত্তির বসে বাচ্চাটা প্রাণপণে চেষ্টা করে চেয়ারসহ মাটিতে পড়ে গেছে। ছুরি তার হাতের খানিকটা কেটে ফেলেছে কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেছে সে। প্রচণ্ড রেগে গেছে শাজাহান সুজা, মুখ বিকৃত করে আবার এগিয়ে আসছে সে।

না! প্রাণপণ চিৎকার করে ওঠে রুমী, থাম-থাম শুয়ারের বাচ্চা!

শক খাওয়া লোকের মতো ঘুরে দাঁড়ায় শাজাহান সুজা।

এক পা নড়েছিল কি তোর জান শেষ করে দেবো—দাঁতে দাঁত ঘষে রুমী বলতে থাকে, আর একটু নড়েছিল কি তোর জিভ টেনে বের করে ফেলবো।

পুলিসের লোকটি বিস্ফারিত চোখে রুমীর দিকে তাকিয়ে থাকে, একমুহূর্তের জন্যে সে ভেবেছিল রুমী বুঝি তাকে কিছু বলছে। কিন্তু রুমীর দৃষ্টি অন্য কোথাও, কথা বলছে অনেকটা নিজের মনে। দেখে ভয় হয়, মনে হয় সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। কি ভয়ানক চেহারা হয়ে গেছে একমুহূর্তে, দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, শক্ত চোয়াল, চোখ টকটকে লাল, কিন্তু পাতা নড়ছে না, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বললো রুমী, আমি আসছি। তোকে আজ দেখে নেবো, শয়তানের বাচ্চা।

পুলিসের লোকটা অবাক হয়ে দেখলো, অদ্ভুত একটা ভঙ্গিতে শাজাহান সুজার বাসার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রুমী, কেন জানি ভয়ে ওর সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। আরও আধঘণ্টা পরে অন্য আরেকজন এসে তাকে ছুটি দেয়ার কথা কিন্তু এতোক্ষণ অপেক্ষা করার সাহস নেই তার, তক্ষুণি সে ছুটলো কাছাকাছি পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ফোন করার জন্যে।

লোহার গেট বাসার সামনে, মস্ত তাল ঝুলছে। রুমী একমুহূর্ত দ্বিধা না করে গেট টপকে ভেতর ঢুক পড়ে। উপরে কাঁটাতার দেয়া, ওর হাত ছড়ে গেছে কিন্তু এখন সে—

নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। কাঁকর বিছানো পথ, দুধারে ফুলের গাছ, অযত্নে, অবহেলায় একটা বুনো রূপ নিয়েছে। ঝিকি ডাকছে কোথায়, মুহূর্তের জন্যে থামতেই বোঝা গেল চারদিক কি ভয়ানক নীরব হয়ে আছে।

দরজা খোলো।

না।

দরজা খোলো, শাজাহান সুজা।

না-না...

প্রচণ্ড জ্বরে ধমকে ওঠে রুমী, দরজা খোল, শুয়োরের বাচ্চা।

শাজাহান সুজা তবু দাঁড়িয়ে থাকে। রুমী বাইরে দাঁড়িয়ে শাজাহান সুজাকে দরজার কাছে টেনে আনে খুব সহজে। ওকে বাধ্য করে দরজা খুলতে। শাজাহান সুজা ছিটকিনি কুলে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে, লাথি মেরে দরজা খুলে ফেললো রুমী। ভয়ে ছিটকে সরে গেল শাজাহান সুজা, ডয়ার হাতড়াচ্ছে প্রাণপণে, পিস্তলটা খুঁজছে ওর।

ততক্ষণে রুমী ঢুকে গেছে ভেতরে।

কি, কি চান আপনি?

রুমী হাসলো। বিকারগ্রস্ত লোকের হাসি। কি চাই? দেখবে, এক্ষুণি দেখবে।

শাজাহান সুজা তখনো ডয়ার হাতড়ে যাচ্ছে, রুমী জানে ও পিস্তলটা খুঁজছে কিন্তু বাধা দিল না সে। কি করবে ও পিস্তল দিয়ে? তাকে গুলি করবে? রুমী জানে সে ইচ্ছা করলে এখন শাজাহান সুজা একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়াতে পারবে না। কি প্রচণ্ড শক্তি ওর ভেতরে! ইচ্ছা করলে শাজাহান সুজার জিভ টেনে বের করতে পারে সে, হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলতে পারে। ও ইচ্ছা করলে খুলি ফেটে তার মস্তিষ্ক বের হয়ে যাবে এখন—পিস্তল দিয়ে কি করবে?

খুঁজে পেয়েছে সে পিস্তলটা—তুলে ধরলো রুমীর দিকে।

রুমী আবার হাসার ভঙ্গি করে, গুলি করতে চাও? তাহলে ঘুরিয়ে নিজের মাথার দিকে নাও।

শাজাহান সুজার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। সারা শরীর খরখর করে কাঁপছে ওর, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাত উঠে যাচ্ছে তার মাথার দিকে।

কি, গুলি করবে?

প্রাণপণ চেষ্টায় মাথা নাড়লো, না-না...

পিস্তলটা আমার দিকে ছুঁড়ে দাও! শাজাহান সুজা পিস্তলটা ছুঁড়ে দেয়। রুমী জীবনে পিস্তল ভালো করে দেখেনি পর্যন্ত, দেখার ইচ্ছাও নেই। লাথি মেরে পিস্তলটা সরিয়ে দিলো দূরে।

কি, কি চান আপনি? শাজাহান সুজার কণ্ঠস্বর শুষ্ক, ভয়ে কাঁপছে।

অনেক কিছু চাই আমি। তোমাকে এমন শিক্ষা দিতে চাই...

কেন? কি করেছি আমি?

প্রচণ্ড রাগে রুমীর মুখ ভয়াবহ হয়ে ওঠে, কি করেছে তুমি? চিৎকার করে ওঠে রুমী, তুমি জানো না? রুমীর অদম্য ক্রোধ প্রচণ্ড একটা শক্তির মতো শাজাহান সুজাকে আঘাত করে, ছিটকে গিয়ে সে পড়ে এক কোনায়, প্রচণ্ড জ্বরে ওর মাথা ঠুকে যায় দেয়ালে। রুমীর রাগের দমকে দমকে ওর সারা শরীর খরখর করে কাঁপতে থাকে, মুখে ফেনা এসে যায় যন্ত্রণায়।

অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে রুমী, আস্তে আস্তে শাজাহান সুজার কাঁপুনিও থেমে যায়। কোনমতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়, প্রচণ্ড ভয়ে ওর মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে।

তুমি কি করেছে তুমি জানো না?

শাজাহান সুজা মাথা নিচু করে থাকে। আস্তে আস্তে মাথা তুলে কাতর ভঙ্গিতে বলে, কিন্তু আমি তো শুধু শুধু করিনি। এই দেখুন, এই ছবিটা আমি ঠেকেছি, পৃথিবীর লোক এই ছবিটা পেতো না আমি যদি কিছু না করতাম...

কি ছবি এটা?

শাজাহান সুজা একটু আশায় ভর করে এগিয়ে আসে, ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, আপনিও বুঝতে পারবেন।

তাকিয়ে দেখলো রুমী।

শাজাহান সুজা দুর্বল ভাবে একটু হাসলো, আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ এটা—‘প্রিন্সের’ থেকে হাজার গুণ ভালো। এরকম আর হবে না—কখনো হবে না! রঙের কাজ আর টেকনিক ছেড়ে দিয়ে শুধু অভিব্যক্তিটা দেখুন।

খুব যত্নের ছবি তোমার?

হ্যাঁ। এটা শেষ করে আমার মরতেও দ্বিধা নেই। একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে শাজাহান সুজা আস্তে আস্তে বলে, মরতেও দ্বিধা নেই।

সিগারেট খাও তুমি?

হ্যাঁ, খুব ব্যস্ত হয়ে শাজাহান সুজা পকেট হাতড়াতে থাকে। সিগারেট বের করে এগিয়ে দেয় রুমীর দিকে।

ম্যাচটা বের করো।

শাজাহান সুজা একটা দামী সিগারেট লাইটার বের করে।

সাবধানে ছবিটার নিচে লাইটারটা জ্বালিয়ে ধরো।

প্রচণ্ড ভাবে চমকে উঠলো শাজাহান সুজা, কি বলছে সে? একমুহূর্তের জন্যে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না ও।

নিচে লাইটারটা জ্বালিয়ে ধরো।

হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল শাজাহান সুজা, আপনি বুঝতে পারছেন না এই ছবির মূল্য। আমাকে মেরে ফেলুন, যা খুশি করুন, কিন্তু এই ছবিটাকে বেঁচে থাকতে দিন।

ছবির নিচে লাইটারটা জ্বালিয়ে ধরো।

কাতর অনুনয়ে শাজাহান সুজার গলার স্বর ভেঙে পড়ে, আপনি একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। তাজমহলকে কেউ যদি বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় আপনার কেমন লাগবে? দা

ভিক্টর মোনালিসাকে কেউ যদি পুড়িয়ে দেয় আপনার কেমন লাগবে? মাইকেল এঞ্জেলোর পিয়তাকে কেউ যদি ভেঙে ফেলে কেমন লাগবে আপনার? আপনি বিশ্বাস করুন এটা ঠিক সেরকম একটা সৃষ্টি। এটা নষ্ট করার অধিকার কারো নেই। আমি অপরাধ করেছি, আমাকে যা ইচ্ছা শাস্তি দিন, আমার ছবির ওপর প্রতিশোধ নেবেন না। একটি বার পৃথিবীর লোককে এই ছবি দেখতে দিন।

লাইটারটা জ্বালিয়ে ছবির নিচে ধরো।

দোহাই আপনার—এটা আমার সন্তানের মতো। আমার যদি একটা সন্তান থাকতো তাকে কি আপনি মারতেন? আমি যতো দোষই করি আমার সন্তানের তো কোনো দোষ নেই। তাকে আপনি বাচতে দিন...

হঠাৎ প্রচণ্ড রাগে ফুঁসে ওঠে রুমী, তোমার সন্তানের মতো! যাদের তুমি মেরেছ তারা কারো সন্তান ছিল না?

রুমীর কথা শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড একটা আঘাতে শাজাহান সুজা ছটকে মাটিতে পড়ে। রুমীর রাগ কমে না আসা পর্যন্ত সে যন্ত্রণায় কাটা মুরগীর মতো ছটফট করতে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে আবার উঠে দাঁড়ায়। কপালের কাছে কেটে গেছে ওর, ফুলে উঠছে ধীরে ধীরে। একটা চোখ প্রায় বুজে গেছে। কাতর অনুনয়ের দৃষ্টিতে শাজাহান সুজা রুমীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

রুমী ওকে আবার আদেশ দেয় ছবিটাতে আগুন ধরানোর জন্যে। শাজাহান সুজা দুই হাত জোর করে ক্ষমা ভিক্ষা চায়। রুমী পাথরের মতো এবারে নিজের শক্তি ব্যবহার করে। শাজাহান সুজা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাঁপা কাঁপা হাতে লাইটারটা জ্বালিয়ে, আস্তে আস্তে আগুনটা ছবির নিচে ধরে। ওর মুখ প্রচণ্ড হতাশায় বিকৃত হয়ে আছে, চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে আগুন ধরে গেল একপাশে। শাজাহান সুজা প্রাণপণ চেষ্টা করলো হাত দিয়ে আগুন নিভিয়ে দিতে, কিন্তু ওর কোনো ক্ষমতা নেই। রুমীর ইচ্ছার দাস হয়ে ও দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। আস্তে আস্তে আগুনটা ছড়িয়ে পড়ছে, দ্রুত এগিয়ে এসে গ্রাস করে নিচ্ছে ছবিটাকে।

আতর্জন করে উঠল শাজাহান সুজা, দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে মাটিতে মাথা কুটতে থাকে প্রচণ্ড দুঃখে। ওর সারা জীবনের স্বপ্ন ওর চোখের সামনে শেষ হয়ে যাচ্ছে, ও একটা ফটো পর্যন্ত তুলে রাখেনি ওটার। আর দেখতে পারলো না, চোখ বন্ধ করে ফেললো, শাজাহান সুজা।

চোখ খোলো, শাজাহান সুজা।

শাজাহান সুজার চোখ খুলে গেল ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ওর চোখের সামনে পুরো ছবিটা ঢেকে গেল জ্বলন্ত আগুনের শিখায়। অনেক ওপরে উঠে গেল আগুনের শিখা, ধোয়ারয়ডের গেছে সারা ঘর, খক খক করে কাশতে থাকে রুমী।

শাজাহান সুজাকে ডাকলো রুমী। তার উত্তর দেয়ার ক্ষমতা নেই, অর্থহীন বোবা দৃষ্টিতে রুমীর দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

খুব একটা সৃষ্টি করেছিলে, বাচ্চাদের খুন করে সৃষ্টি করো তুমি! বাচ্চারা সৃষ্টি না, সৃষ্টি তোমার ঐ আর্ট। প্রচণ্ড ঘৃণায় রুমীর মুখ বিকৃত হয়ে উঠতেই আবার শাজাহান সুজা ছটকে পড়ে মাটিতে। রুমীর তীব্র দৃষ্টিতে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে যন্ত্রণায়।

ভীষণ দুর্বল লাগতে থাকে রুমীর। ও আস্তে আস্তে সোফায় গিয়ে বসে, পুলিশ এসে যাবে যে কোনো মুহূর্তে, তখন ওর কাজ শেষ। হঠাৎ ওর চোখ পড়ে বাচ্চাটার ওপর, রুমী ওর কথা ভুলেই গিয়েছিল। শক্ত করে বাঁধা চেয়ারে, রক্তাক্ত শরীর, বাম হাত থেকে তখনো রক্ত চুইয়ে পড়ছে। রুমী চোখের দৃষ্টি কোমল করে ওর দিকে এগিয়ে যায়, বাচ্চাটা ভীত চোখে ওকে লক্ষ্য করে, ওর ঠোট থরথর করে কাঁপছে।

ভয় কি তোমার? ভয় নেই, তোমাকে আর কেউ কিছু করতে পারবে না। রুমী ওর দড়ির বাঁধন খুলে দিতে লাগলো।

বিড়বিড় করে কথা বলছে শাজাহান সুজা। কান পেতে শোনার চেষ্টা করে রুমী, প্রথমে মনে হচ্ছিল অসংলগ্ন কথা, কিন্তু আসলে তা নয়। প্রচণ্ড দুঃখে ওর বুক ভেঙে গেছে তাই নিজেকে সাজনা দিচ্ছে নিজেকে। বলছে, এটা পুড়ে গিয়েছে তো কি হয়েছে? আবার আঁকবো আমি, আবার আঁকবো। আরও ভালো করে আঁকবো আমি, আরও অনেক যত্ন করে। আমি শিল্পী, আমার চোখ আছে, আমার দেখার ক্ষমতা আছে, আমার সৃষ্টির ক্ষমতা আছে। ক'জনের আছে আমার মতো ক্ষমতা? আমি আবার সৃষ্টি করবো। দরকার হলে আবার ধরে আনবো নাওরা জানোয়ারগুলোকে, গলা টিপে মেরে...

প্রচণ্ড রাগ রুমীর শিরদাঁড়া বেয়ে উঠতে থাকে—প্রচণ্ড রাগ! দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, আবার ছবি আঁকবে তুমি? আবার সৃষ্টি করবে? তোমার ঐ চোখ দিয়ে তুমি দেখবে আর সৃষ্টি করবে?

রুমী ওর দিকে এগিয়ে যায়, তোমার চোখ আমি ছিড়ে নেব, ছিড়ে উপড়ে নেব। চোখ উপড়ে নেবার ভঙ্গি করে রুমী, আর হঠাৎ ফিঁকি দিয়ে রক্ত ছুটে এলো শাজাহান সুজার চোখ থেকে। প্রচণ্ড আতর্জন করে দুই চোখ ঢেকে ফেললো শাজাহান সুজা, হাতের ফাঁক দিয়ে গল গল করে রক্ত বের হতে থাকে।

রুমীর মনে হয় তার মাথাটা হালকা হয়ে গেছে। সমস্ত ঘরটা যেন ওর চোখের সামনে ঘুরে ওঠে। সাবধানে সে সোফার হাতল ধরে বসার চেষ্টা করলো, ঘরটা আরও জোরে ঘুরছে, আলোগুলি যেন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, ও তাকিয়ে থেকেও আর দেখতে পাচ্ছে না। কোলাহলের মতো শব্দ ভেসে আসতে থাকে, চেউয়ের মতো সে-শব্দ এগিয়ে আসছে, আস্তে আস্তে তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। রুমী সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে খুব ধীরে ধীরে জ্ঞান হারালো।

বাইরে তখন পুলিশের জীপ এসে থেমেছে।



www.banglabook.com

পরিশিষ্ট

এগারো

শাজাহান সুজাকে অন্ধ অবস্থায় তার বাসায় গ্রেফতার করা হয়। কি এক অজ্ঞাত কারণে তার দুই চোখেরই নার্ভ ছিড়ে গিয়ে সে অন্ধ হয়ে গেছে। বহুদিন চিকিৎসাধীন থাকলো সে। প্রচণ্ড শকে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে বলে তার বিচার অনেকদিন বন্ধ রাখা হয়েছিল। বিচারের বিশেষ কিছু ছিলও না, নিজেই সব ক'টি শিশুহত্যার অপরাধ স্বীকার করেছে। এ নিয়ে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তার কোনো অনুতাপ ছিল না। বিচারে ওর মৃত্যুদণ্ডই হতো কিন্তু রায় বের হওয়ার আগেই সে জেলখানায় মারা গেল। অনেকে বলে আত্মহত্যা করেছে, অনেকে বলে জেলখানায় অন্যান্যরা তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। কোনটি সত্যি এখনো সেটা ভালো করে জানা যায়নি। কিভাবে মারা গেছে সেটা নিয়ে বিশেষ কারো মাথাব্যথা নেই, শাজাহান সুজা যে মারা গেছে সেটাই অনেকের কাছে একমাত্র স্বস্তির কথা।

যে-রাতে শাজাহান সুজাকে গ্রেফতার করা হয়, সে-রাতে রুমীকেও তার বাসা থেকে উদ্ধার করা হয়। রুমীর বাইশ বছরের জীবনে মস্তিস্কে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপাচার করে তাকে বাঁচাতে হয়েছে। তার মস্তিস্কের বড় একটা অংশ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তারেরা সন্দেহ করেছিলেন সে হয়তো জ্ঞান বুদ্ধিহীন অথর্ব একটা মানুষে পরিণত হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল রুমী খুব ভালো ভাবেই সামলে উঠেছে। তার দৈহিক কোনো সমস্যাই হয়নি, বুদ্ধিমত্তাও পুরোপুরি স্বাভাবিক রয়েছে, কিন্তু স্মৃতি একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সে তার অতীতের একটি কথাও মনে করতে পারে না। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করলেন। শাজাহান সুজাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে সে একলাখ টাকা পুরোটাই পেয়েছিল। তার থেকে অনেকখানি ওর চিকিৎসার জন্যে ব্যয় করা হলো, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। অন্যেরা যদিও রুমীর স্মৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়াটা খুব গুরুত্ব নিয়ে দেখছিল তবু সে নিজে এ ব্যাপারে বেশি বিচলিত হয়নি। তার স্মৃতির কিছুই অবশিষ্ট নেই, তাই সে জানতোও না কি নিয়ে তার বিচলিত হওয়া উচিত।

রুমী একটু সুস্থ হওয়ার পর ওর বোন শানু ওকে নিজের কাছে নিয়ে গেল। প্রথম প্রথম সে শানুকে দেখে একটু লজ্জা পেতো, এই সুন্দরী মেয়েটি তার বোন তার বিশ্বাস হতে চাইতো না। বোনের ছোট ছেলেটির সাথে তার ঘনিষ্ঠতা হলো খুব সহজে, বড়দের সাথেই তার কথাবার্তা বলতে অসুবিধে অসুবিধে হতো। কখন কিভাবে কি বলতে হয় সে তখনো শিখে উঠতে পারেনি। তার নাকি এম. এস. সি. পরীক্ষা দেবার কথা ছিল, কিন্তু এ বছরটা অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই, যদিও সবাই চায় যে সে আবার ঢাকা গিয়ে পড়াশোনা শুরু করুক, কিন্তু তার নিজের সেরকম কোনো ইচ্ছা নেই। সে কেন গ্রামে থাকতে পারে না, এই সহজ ব্যাপারটা এখনো কেউ তাকে বুঝিয়ে দিতে পারেনি। সে তার বোনের স্বামীর মতো দোকান দেবে বলায় একদিন সবাই এমন ভাবে তার মুখের উপর হেসে উঠেছিল যেন সে ভারি মজার কথা বলেছে। রুমী আজকাল তাই কাউকে কিছু বলে না, সে কি করবে সেটা সে নিজেই ঠিক করবে। তার নাকি অনেক টাকা জমা আছে

ব্যাংকে, সেটা কিভাবে তুলতে পারবে এখনো জানে না। জেনে নিতে পারবে সে কদিনের ভেতরেই। তখন টাকাটা তুলে এনে কলশ নদীর চরটা কিনে নেবে ও , ওখানে নাকি খুব ভালো ধান হয়। কিছু টাকা দিয়ে সে গ্রামের স্কুলটা ঠিক করিয়ে দেবে। হেড মাস্টারের সাথে কথা বলেছে গোপনে, সে চাইলেই তিনি তাকে একটা মাস্টারী দিয়ে দেবেন। স্কুলে অংক আর বিজ্ঞান পড়ানোর কেউ নেই, সে বি. এস. সি. তে অনার্স, তবুও একটু ভয়ে ভয়ে ছিল হয়তো অংক বিজ্ঞান সব ভুলে গেছে এই ভেবে, কিন্তু স্কুলের অংক বই খুলে দেখেছে খুব সহজ। কিছুই ভুলে যায়নি।

কদিন আগে ঢাকা থেকে কিবরিয়া চৌধুরী নামে একজন তার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, একসময়ে নাকি তার সাথে খুব বন্ধুত্ব ছিল। কেমন রাগী রাগী আর অসুখী মানুষের মতো চেহারা। তাকে অনেক বুঝিয়ে গেছেন যেন সে ঢাকা চলে আসে, যাওয়ার আগে তাকে চিঠি লিখলেই তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। ঠিকানা রেখে গেছেন তার কাছে। তাকে সে কিছু বলেনি, বললে ভদ্রলোক হয়তো রেগে যেতেন। কেউ গ্রামে থাকতে পারে সেটা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। রুমী কিন্তু গ্রামেই থাকবে, যে যাই বলুক তাকে।

অনেক ঘুরে দেখেছে সে। সড়ক ধরে অনেক দূর হেঁটে গেছে, কি সুন্দর ধানের খেত দুপাশে, বাতাসে যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আকাশে সাদা মেঘ এপাশ থেকে ওপাশে ভেসে যায়। একদিন কালো মেঘে আকাশ ঢেকে গেল, রুমীর দেখে আশ মেটে না, বিজলী চমকতে থাকে, তারপর কি গুড় গুড় মেঘের ডাক। রাখাল ছেলেরা গরু ছুটিয়ে নিয়ে আসছে গোয়ালে, উঠনে শুকাতো দেয়া ধান হৈ চৈ করে তুলে নিচ্ছে মেয়েরা, মোরগগুলি কঁক কঁক করে ঘরে ঢুকছে সন্ধ্যা হয়ে গেছে ভেবে। দেখতে দেখতে ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে এলো, ভেসে গেল যেন পৃথিবী। ভেজা শাড়ি পরে মেয়েরা ছুটোছুটি করতে থাকে, সংসারের খুঁটিনাটি জিনিস তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিতে চায়। এসব দেখে আনমনা হয়ে যায় রুমী।

নৌকো করে গিয়েছিল একবার, নদীর দু'তীরে তাকিয়ে সে স্তব্ধ হয়ে যায়, দূরে কাশবন, ঝোপঝাড়, বনজঙ্গল। আকাশে মেঘ, তার মাঝে সারি সারি বক উড়ে যায় দক্ষিণে। নদীর কালো পানি দেখে অবাক হয়ে যায় রুমী, কে জানে কত রহস্য লুকানো আছে ওখানে। জেলেরা মাছ ধরছে তার মাঝে হঠাৎ একটা শুশুক লাফিয়ে উঠে আবার ডুবে যায় পানিতে। সন্ধ্যার পড়ন্ত আলোতে নিচু গলায় কথা বলে মাঝিরা, নৌকোর গলুইয়ে চুলো জ্বালিয়ে রান্না চাপায়। রাতে কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে খেতে বসে সবাই। লাল চালের ভাত, মুগের ডাল আর মাগুর মাছের ঝোল, খেতে অমৃতের মতো লাগে ওর।

ভোরে কুয়াশায় মাঠ ঢেকে থাকে, হাঁকো খেতে খেতে গল্প করে চাষীরা, তামাকের মিটি গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আসে। লাঙ্গল গরু নিয়ে মাঠে চলে যায় সবাই ভোরের আলো ফোটার আগে। রুমী চুপচাপ ওদের দেখে, মনে হতে থাকে সে ওদেরই একজন। শহরে ও যাবে না, এখানেই থাকবে, এদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে থাকবে, যে যাই বলুক না কেন।

একটা মোটে জীবন, সেটা সে নষ্ট করবে না এবার।

For More Books
Please Contact At:

RONY

shaibalrony@yahoo.com

01914882384